ভজহরি

শ্রীজ্যোতির্ম্ময় ঘোষ,
এম. এ, পি-এচ. ডি.
("ভাস্কর")

১৯২৫

ভূমিকা

এই গল্পগুলির নায়কের নাম ভজহরি।

গল্পগুলি সবই বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

প্রথম দুইটি গল্প অন্য পুস্তকে প্রকাশিত হইলেও, 'ভজহরি' নামের সঙ্গতির জন্য এই পুস্তকেও মুদ্রিত হইল।

গ্রন্থকার

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক

লেখা	৩৲
শুভশ্রী	১৷৹
মজলিস	১৷৹
কথিকা	১৷৶
A German Word Book for Beginners	Rs. 1/8
A French Word Book for Beginners	Re. 1/-
গণিতের ভিত্তি	As. 8/-

সূচীপত্র

পান

ভজহরি বেকার।

ভজহরি বিনামূল্যে শব বহিয়াছে, ধাঙ্গড়-স্ট্রাইকের সময়ে রাস্তা পরিষ্কার করিয়াছে, ইলেক্‌শনের সময়ে একটি সিকি এবং একখানি কাট্‌লেটের বিনিময়ে লরির উপরে মেগাফোন-হাতে, ভোট ফর—করিয়াছে, বেকার-সমিতির সম্পাদকত্ব করিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই বেকারত্ব ঘোচে নাই। মেস হইতে মেসান্তরে, হোটেল হইতে হোটেলান্তরে ঘুরিয়াছে, ফ্রেণ্ডস চার্জ বাকি পড়িয়াছে, জামার বোতাম পড়িয়া গিয়াছে, দাড়ি গোঁফ বড় হইয়াছে, জুতায় পটি লাগিয়াছে, তবু বেকারত্ব ঘোচে নাই।

মেছুয়াবাজারের একটি মেসে ভজহরি আপাতত থাকে। সারাদিন টো টো—রাত্রে একটু ঘুম। নেশার মধ্যে পান। সত্যই, ভজহরি ভীষণ পান খায়। অর্থাৎ একটা পান না খাইলে ভজহরির ঘুম আসে না।

মেসের পান সব দিন ভাগ্যে জোটে না। কোন দিন থাকেই না, কোন দিন ফুরাইয়া যায়। ভজহরি তাই খাওয়া-দাওয়ার পর একটি পয়সা সঙ্গে করিয়া রাস্তার মোড়ে যায়। সামনে যে দোকান পায়, সেখান হইতেই এক খিলি পান কিনিয়া খায়।

সেদিন রাত্রি প্রায় দশটা হইবে। ভজহরি মোড়ের একটি দোকানের পাশে গিয়া বলিল, এক পয়সার পান দাও তো—মিঠে পান।

পানওয়ালা কথা বলে না। সে আপন মনে সামনে সাজানো চেরা এবং আধ-চেরা পানের উপরে খয়েরের গোলা মাখাইতে লাগিল।

ভজহরি বলিল, এক পয়সার পান দাও।

কোন জবাব নাই। পানওয়ালা নির্বিকার চিত্তে পান সাজিতে লাগিল।

ভজহরি পুনরায় বলিল, এক পয়সার পান দাও না হে!

বলি, নিমাই চাটুজ্জে, না নিতাই মুখুজ্জে?

সে আবার কি? আমার নাম তো ভজহরি সরখেল। আমার নামে তোমার কি দরকার? পান এক পয়সার দেবে তো দাও।

তোমার নামের জন্য তো আমার ঘুমই হচ্ছে না। বলি, নিমাই চাটুজ্জে, না নিতাই মুখুজ্জে?

তোমার হেঁয়ালি রাখ। আর একদিন অবসরমত শুনব। আমার এখন ঘুম পাচ্ছে। দাও, এক পয়সার মিঠে পান দাও তো দেখি।

বলি, নিমাই চাটুজ্জে, না নিতাই মুখুজ্জে?

ভাল বিপদ তো! আমি বাপু, তোমার কথা কিছু বুঝতে পারছি না।

নাঃ, কিছু বুঝতে পারছেন না! ন্যাকা!

ভজহরি বড়ই মুস্কিলে পড়িল। এদিকে সারাদিনের ব্যর্থ পরিশ্রমের পর ঘুমে চোখ বুজিয়া আসিতেছে, ওদিকে সামনে সাজানো ছাঁচি, বাংলা, মিঠা, মাদ্রাজী, সাজা আর আধ-সাজা পানের রূপে, গন্ধে, রসে জিভ লালায়িত হইয়া বার বার তালু স্পর্শ করিতেছে। ভজহরি চিন্তায় পড়িল—ব্যাপার কি? নিমাই চাটুজ্জে, নিতাই মুখুজ্জে? কোন দিন নামও তো শুনি নি! অথচ—ভগবান, কেন বেকার করলে? বেকারই যদি করলে, তবে বাঙালী করলে কেন? বাঙালীই যদি করলে, তবে একটু বুদ্ধি দিলে না কেন? আমি কি দুরভিসন্ধি নিয়ে পান কিনতে এসে ন্যাকা সেজে রয়েছি, তা এই সম্পূর্ণ অপরিচিত পানওয়ালা জেনে বুঝে ফেলল, অথচ আমি নিজেই জানতে পারলুম না! এই বুদ্ধিটুকু নেই ব'লেই বোধ হয় বেকার হয়ে রয়েছি।

ভজহরি নিতান্ত বোকার মতই কিছুক্ষণ হাঁ করিয়া রহিল, দোকানদার অন্য খরিদ্দারের সঙ্গে কথা বলিতে লাগিল। দোকানদারের সহিত আর কথা বলিবার প্রবৃত্তি ভজহরির ছিল না। কিন্তু পান তো চাই। শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবার জন্য ভজহরি আর একবার জিজ্ঞাসা করিল, নেহাতই পান দেবে না তা হ'লে? দোকানী কোন কথাই বলিল না। ভজহরি অগত্যা পথে পা বাড়াইল।

ফুটপাথের অপর পারে, গ্যাসের আলোর নীচে কয়েকজন বসিয়া তাস খেলিতেছিল। তাহাদের আকৃতিও প্রায় ভজহরি-জাতীয়। তাসগুলি ময়লা হইয়া এবং পাশগুলি ছিঁড়িয়া যে অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে দুই এক বার খেলিবার পর পিছন দিক হইতেই তাসগুলি চেনা যায়। ভজহরির পান-সমস্যা ইহারাও লক্ষ্য করিয়াছিল। যখন ভজহরি পানের দোকান হইতে চলিয়া যাইতেছিল, তাহাদের মধ্যে একজন তাহাকে ডাকিয়া বলিল, কি হয়েছে হে?

ভজহরি বলিল, এক পয়সার পান চাইলুম, তা বলে—নিমাই চাটুজ্জে, না নিতাই মুখুজ্জে! এসব হেঁয়ালি তো আমি বুঝতে পারলুম না।

ও, এই কথা। এদিকে এস, বুঝিয়ে দিচ্ছি। এ পাড়ায় দুটো দল আছে। একটা হচ্ছে, নিমাই চাটুজ্জের দল, আর একটা নিতাই মুখুজ্জের দল। এক দলের লোক অন্য দলের লোকের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখে না।

কিন্তু মাত্র এক পয়সার পান—

এক পয়সাই হোক, আর এক লাখ টাকাই হোক, প্রিন্সিপ্‌ল ইজ প্রিন্সিপ্‌ল।

কিন্তু এটা তো একটা পানের দোকান।

দোকানই হোক, আর যাই হোক, প্রিন্সিপ্‌ল ইজ প্রিন্সিপ্‌ল।

কিন্তু আমি তো কোন দলে নই।

থাকতেই হবে। ঐ যে ঐ ল্যাম্পপোস্টের পাশে একটা পানের দোকান, ওটা অন্য দলের।

ওখান থেকে তো একদিন পান কিনেছি।

অতএব প্রমাণ হয়ে গেছে, তুমি ঐ দলের।

প্রমাণ হয়ে গেল ?

হ্যাঁ, প্রমাণ হয়ে গেল। প্রমাণ যদি নাও হয়, তা হ'লে ধ'রে নেওয়া গেল, অনুমান ক'রে নেওয়া গেল, কল্পনা ক'রে নেওয়া গেল, মানে ঐ একই কথা।

কিন্তু আমি যদি কোন দলে না থাকতে চাই ?

থাকতেই হবে। পৃথিবী যেমন জল ও স্থলে বিভক্ত, তেমনই এ পাড়াটা নিতাই চাটুজ্জে আর নিমাই মুখুজ্জেতে বিভক্ত। একটাতে থাকতেই হবে। পড় নি ছেলেবেলায়, Man is a gregarious animal ? মানুষ কেন, পৃথিবীর সব জীবেরই দল আছে। বাঘের দল, ভালুকের দল, শেয়ালের দল—

বুঝেছি। তবে এইসব দল বাঁধার মধ্যে সামান্য একটু প্রভেদ আছে। কারও কারও দল বাঁধার পেছনে থাকে একটা instinct of self-preservation, আর কারও কারও দল বাঁধার পেছনে থাকে একটা instinct of suicide। যাকগে। তা হ'লে এ পানওয়ালা ?

নিমাই চাটুজ্জে।

ভজহরি পুনরায় রাস্তা পার হইয়া নিমাই চাটুজ্জের দলে নাম লিখাইয়া এক পয়সার মিঠা পান কিনিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে মেসে ফিরিল। এ পারের তাসের আসরে হরতনের গোলাম তুরুপ হইল।

উপায়

বেকার ভজহরি এখনও বেকার।

সারাদিন টো টো করিয়া, সন্ধ্যার পর ছাদে পায়চারি করিয়া, নরহরির ফ্রেণ্ড-রূপে মেসের ডাল-ভাত গিলিয়া, রাস্তার মোড় হইতে এক পয়সার মিঠে পান চিবাইয়া ঘরে ফিরিয়াছে। নরহরি লুঙি পরিয়া খাটের উপুর বসিয়া বিড়ি খাইতেছে। নরহরি বলিল, কি খবর, কিছু সুবিধে টুবিধে—

কিছু না ব্রাদার, কিছু না। আমি ঠিক ক'রেছি—

কি ঠিক ক'রেছ?

ঠিক ক'রেছি, সুইসাইড ক'রব।

তাতে আর লাভ কি?

সুইসাইড কি আর কেউ লাভের জন্য করে? সত্যি, ঘেন্না ধরে গেছে। কত ব্যাটার কাছে গেলাম, দেখাই করে না। কার্ড ফিরিয়ে দেয়। কারো ভাগ্‌নে কিংবা সম্বন্ধী না হ'তে পারলে আর কোন আশা নেই। কিন্তু সে তো আর আমার হাতে নয়!

তোমার হাতে যা আছে তা তো হ'তে পার?

কি হ'তে পারি?

জামাই।

আমাকে যিনি জামাই ক'রবেন, তিনি কি দরের লোক হবেন, তা তো বুঝতেই পারছ। তাছাড়া মেয়েকে চৌকাঠ পার করিয়ে দেবার পরক্ষণেই প্রায় সব শ্বশুরই সম্বন্ধ বদলে ফেলেন!

তুই একটা অতি ইয়ে! সেইজন্যই তোর কিছু জোটে না। সে যাক গে। আমি যা বলি তাই কর। একটা বিধবার মেয়ে বিয়ে কর, শ্বশুরের ইয়ে সইতে হবে না।

তোর ফাজলামোটা বন্ধ কর দেখি। ইয়ার্কিরও একটা সময় অসময় আছে। তোর তিন সপ্তার ফ্রেণ্ডস্ চার্জ বাকি পড়েছে, খেয়াল আছে?

দেখ্, ফাজলামি করছি নে। যে যুগের যা। আজকাল ব্যাচিলারের চেয়ে বিবাহিতেরই চান্স্ সব দিকে বেশি। একটা বেশ চটুলা, চতুরা, চঞ্চলা, চপলা, ইংরেজি-জানা মেয়ে বিয়ে করে ফ্যাল—দেখিস্ কপাল ফিরে যাবে।

স্ত্রীভাগ্যে ধন কি আর সকলের জোটে!

জোটে রে জোটে। রোস, আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলেছে।

দুই বন্ধুতে বসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া পরামর্শ হইল। তারপর নরহরি এবং ভজহরি পাশাপাশি দুইখানি নড়বড়ে খাটে শুইয়া পড়িল।

২

পরদিন। মেসে সম্প্রতি একটি নূতন চাকর আসিয়াছে। ফর্সা রঙ, ছিপছিপে গড়ন, বয়স কম। গোঁফ উঠি উঠি করিতেছে, কিন্তু এখনও ওঠে নাই। লেখাপড়া জানে। তাহাকে ডাকিয়া নরহরি বলিল, কেষ্ট! তুই এর আগে কোথায় ছিলি?

সে কথা আর কেন জিজ্ঞেস করেন? ছিলুম এক যাত্রার দলে, সখী সাজতুম, কুড়ি টাকা মাইনে পেতুম। দুই অংশীদারে মিলে ঝগড়া করে দল দিলে ভেঙে। দায়ে পড়ে এখন আমার এই অবস্থা, নইলে—

শোন, তোকে আবার সখী সাজতে হবে। পঁচিশ টাকা মাইনে পাবি।

কোন দলে বাবু? আমি তাহলে আজই কাজে লেগে যাই। দেখবেন, কেমন নাচি?

এই বলিয়া কেষ্ট নরহরির ঘরে ভজহরির সম্মুখে কোমর দোলাইয়া হাত ঘুরাইয়া মডার্ন ঢঙে একটু নাচিয়া ফেলিল।

নরহরি বলিল, থাক, আপাতত তোকে নাচতে হবে না। এখন থেকে মাস তিনেক তোকে আমার ফ্রেণ্ড ভজহরির স্ত্রী সেজে থাকতে হবে। ওঁ যখন যেখানে থাকবে, সেখানে থাকবি; ও যা বলবে তাই করবি। বুঝলি?

যে আজ্ঞে! মাইনেটা কিন্তু সময়মত চাই।

সে হবে। কোন ভাবনা নেই।

কেষ্ট আপাতত মেসের কাজে গেল। পাশের ঘরের বাবু কচুরি আর বিড়ির অপেক্ষায় অধৈর্য হইয়া উঠিয়াছেন। কেষ্ট দোকানে ছুটিল। পরদিন হইতে সে নূতন চাকরিতে বহাল হইবে।

ভজহরি বলিল, এত সব খরচপত্র। কাপড় চোপড়, জুতো, গয়না, হোটেলের খরচ—

তোর কোন ভাবনা নেই। তিনমাসের সব খরচ আমি দেব। আমার পাশ বইতে কিছু আছে। চাকরি পেলে পরে আমার টাকা দশ পার্সেণ্ট সুদ সমেত ফিরিয়ে দিস। এটা আমার একটা ইন্‌ভেস্টমেণ্ট, বুঝলি?

কিন্তু যদি সবই বৃথা হয়?

এ প্ল্যান কখনই ব্যর্থ হবে না। নে, সব জোগাড় টোগাড় ক'রে তৈরি হয়ে নে।

৩

ভজহরি সস্ত্রীক অর্থাৎ সকেষ্ট 'আদর্শ হোটেলে' আসিয়া উঠিয়াছে। ছোট একটা সাজানো ঘর। কোন অসুবিধা নাই। খাওয়া-দাওয়া ঘরেই হয়। স্টেট্স্ম্যান ও অমৃতবাজার রাখা হইয়াছে। প্রত্যহ সকালে 'ওয়ান্টেড'গুলি ভাল করিয়া দেখিয়া, যেগুলি কাজে লাগিবার সম্ভাবনা সেগুলিকে কাঁচি দিয়া কাটিয়া রাখা হয়। একখানা কম্বাইণ্ড ভিজিটিং কার্ডও ছাপান হইয়াছে। কার্ডখানি এইরূপ :

প্রতিদিন আহারাদির পর দুইজনে উপরোক্ত কাটিংগুলি এবং কয়েকখানা ভিজিটিং কার্ড লইয়া বাহির হন এবং যেখানে যেখানে সাক্ষাৎ করা দরকার, সেখানে সাক্ষাৎ করিয়া আসেন। কাজ হউক বা না হউক, ভজহরি দেখিতেছে যে এখন আর সাক্ষাৎ করা সম্বন্ধে কোন অসুবিধা নাই। নরহরির প্ল্যান যে একটু কার্যকরী হইয়াছে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ রহিল না।

একদিন হোটেলের ম্যানেজারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা রোজই দুপুরে বেরোন দেখছি। কোথায় যান বলুন তো?

ভজহরি বলিল, আর বলেন কেন মশাই! স্ত্রীর হয়েছে

ডিস্‌পেপ্‌সিয়া। অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি থেকে আরম্ভ করে কত কি করলুম, কিছুতেই কিছু হয় না। রোজ এক একজন নূতন ডাক্তার দেখাচ্ছি। ফতুর হয়ে গেলাম মশাই!

আহা, তাইতো! এইটুকু বয়সে—

গেরো মশাই, গেরো! নইলে কি আর—

ম্যানেজার আর কিছু বলে না। এমন রোগী তার হোটেলে প্রায়ই আসে। এই সব রোগীর পয়েই তো হোটেল এই কয় বৎসরেই এমন ফাঁপিয়া উঠিয়াছে।

৪

মিসলেনিয়াস ওয়ার্কার্স লিমিটেড। ম্যানেজার মিঃ তরুণকান্তি ব্যানার্জি। দুইপাশে ফাইলের গাদা, পিছনে ফাইল-হাতে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট, উপরে ঘূর্ণ্যমান পাখা। বেলা সাড়ে এগারটা। বেয়ারা একখানা কার্ড আনিয়া দিল—বলা বাহুল্য, ভজহরির কম্বাইণ্ড্‌ কার্ড। কার্ডখানি হাতে করিয়াই মিঃ ব্যানার্জি সহকারীকে বলিলেন, একটু পরে আসবেন। বেয়ারাকে বলিলেন, সেলাম দেও।

সস্ত্রীক ভজহরি ভিতরে আসিয়া পাশাপাশি দুইখানা চেয়ারে বসিল। নমস্কার-পর্ব শেষ করিয়া ভজহরি একটি কাটিং মিঃ ব্যানার্জির হাতে দিল। মিঃ ব্যানার্জি বলিলেন, কাজ একটা আছে বটে, তবে সেটা মিসেস্‌ সরখেলেরই উপযুক্ত কাজ। মানে, সর্টিং অফ লেটার্স। এই ঘরেই বসে উনি কাজ করবেন। কোন অসুবিধে হবে না। সর্টিংটাই অফিসের সবচেয়ে দরকারী কাজ, বুঝলেন কি না। দরকারী চিঠিগুলো ঠিক্‌ মত সর্ট করে অফিসের সবাইকে পৌঁছে দেওয়া দরকার। এসব বেয়ারাদের দিয়ে ওকাজ চলে না। তা বেশ, কাল থেকেই উনি

আসবেন। দশটায় অফিস খোলে, সাড়ে দশটার মধ্যেই আসা চাই। আচ্ছা, নমস্কার!

ভজহরি সস্ত্রীক হোটেলে ফিরিল। কেষ্ট বলিল, এ কি হ'ল? আপনি যে একেবারে চুপ ক'রে রইলেন সেখানে?

ব্যাপারটা এমনই হঠাৎ হলো যে আমি কি বলব বা কি বলব না, তা ঠিকই ক'রতে পারলুম না। ম্যানেজারটাকে চটাতেও সাহস হ'ল না। দেখি, নরহরি কি বলে।

সন্ধ্যার পর স্ত্রীকে হোটেলে রাখিয়া ভজহরি নরহরির মেসে গিয়া তাহাকে বলিল, তোমার বুদ্ধিটা যে অতিবুদ্ধি হ'য়ে দাঁড়াল।

ব্যাপার কি?

এযে উল্টা বুঝিলি রাম!

মানে?

মানে কেষ্টর চাকরি হ'য়ে গেল।

নরহরি সবিশেষ শুনিল। তারপর দুইজনে কিছুক্ষণ পরামর্শ করিবার পর ভজহরি হোটেলে ফিরিল। কেষ্ট বলিল, এখন উপায়?

উপায় হবে। ঘাবড়াস কেন?

আমার সঙ্গে কিন্তু তিনমাসের চুক্তি। এর মধ্যে যা হয় করুন।

তিনমাস না হয় ছ'মাস হবে। তোর তো দেখছি, পোয়া বারো। ডবল মাইনে আর বসে বসে পাখার বাতাস খাওয়া।

যাই হোক, যা ক'রবেন শিগ্‌গির করে ফেলুন। বেশি দিন কিন্তু আমি এসব পারব না।

বেশিদিন করতে হবে না।

কিছুক্ষণ আলোচনার পর ভজহরি সস্ত্রীক আহারে বসিল।

পরদিন এ হোটেল ছাড়িয়া আদর্শ-নিবাসে গিয়া উঠিল।

৫

মিসলেনিয়াস্ ওয়ার্কার্স লিমিটেড্। তরুণবাবুর অফিস। বেলা পাঁচটা। ফাইল-বগলে অ্যাসিস্টাণ্টদের দল ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। দিনের কাজ সারিয়া বাড়ী ফিরিবার জন্য সকলেই ব্যস্ত। ঘরের একপাশে টেবিলের উপর বাঁ হাতের কনুই রাখিয়া এবং হাতের উপর মাথা রাখিয়া মিসেস সরখেল চোখ মিট মিট করিতেছেন।

তরুণবাবু একটু বিরক্তির স্বরেই বলিলেন—ওঃ, ফাইল আর ফাইল! আমাকে আপনারা মেরে ফেলবেন দেখছি। আপনাদের সব হ'ল কি? যেখানকার যত পুরাণো কেস, সব একসঙ্গে করে সবাই এসে জ্বালাতন আরম্ভ করেছেন। আফিসটা কি পালিয়ে যাচ্ছে, না ফাইলগুলো পাখা মেলে উড়ে যাবে? এত তাড়া কিসের? আজ আর না। আমি এখুনি বেরুবো। দরকারী এনগেজমেণ্ট আছে। যাচ্ছি একটা ক্যাপিট্যালিস্টের কাছে। লাখ-খানেক টাকার শেয়ার গতাতে হবে।

একজন অ্যাসিস্টাণ্ট নিম্নস্বরে বলিলেন, মোটে লাখ-খানেক?

অ্যাসিস্টাণ্টগণ আস্তে আস্তে অন্তর্হিত হইলেন। তরুণবাবু বলিলেন, মিসেস্ সরখেল!

বলুন।

আপনি কি এখুনি বাড়ী যাবেন?

অপিসই যখন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তখন আমি আর বসে থেকে কি করব? চিঠি সর্ট করা তো হ'য়ে গেছে বারটায়। বসে বসে তো আমার পায়ে খিল ধরে গেল।

আমিও তো যাচ্ছি আপনাদের ওদিকেই। চলুন না আমার গাড়ীতেই—

আমি তো ট্রামেই গিয়ে থাকি।

আচ্ছা, আজ চলুন আমার সঙ্গে।

মিসেস্ সরখেল নিরুত্তর। মৌনং সম্মতিলক্ষণং। তরুণবাবু বলিলেন, আচ্ছা আপনি তাহলে আগে যান, আমার গাড়ী তো চেনেন—বস্থন গিয়ে। আমি আস্‌ছি।

গাড়ীতে বসিয়া তরুণবাবু বলিলেন, উঃ কি গরম! একটু গঙ্গার ধার দিয়ে ঘুরে যাওয়া যাক। আউটরাম ঘাটের নিকট গিয়া তরুণবাবু বলিলেন—আস্থন, এক কাপ চা—

না থাক্।

না, সে হবে না। চলুন, আপিসের এই হাড়-ভাঙা খাটুনির পর একটু—। চিঠি সর্ট করা কি যা তা কাজ—অফিসের সব কাজের চেয়ে দরকারী কাজ হচ্ছে ওইটি। সমস্ত বিজ্‌নেসটাই তো চলছে চিঠির উপরে।

মৌন সম্মতির সহিত মিসেস সরখেল তরুণবাবুর সঙ্গে গিয়া চায়ের টেবিলের পাশে বসিলেন। তরুণবাবুর বাড়ীর পাশের বাড়ীর একটি ছেলে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে আউটরাম ঘাটে বেড়াইতে আসিয়াছে। ছেলেটি তরুণবাবুকে দূর হইতে একটা নমস্কার করিয়া সরিয়া গেল। তরুণবাবু চা-পান শেষ করিয়া জলের ধারে একটু পায়চারি করিয়া মোটরে উঠিলেন।

তরুণবাবু বলিলেন—এ জায়গাটা বেশ, না?

হুঁ।

এখনই বাড়ী যাবেন?

কোথায় যেতে চান?

মেট্রোয় যাবেন? একটা ভাল ছবি আছে। আপনার স্বামী কিছু মনে ক'রবেন না ত?

এতে আর মনে ক'রবার কি আছে ?

মেট্রোর প্রশস্ত বারান্দার পাশে গাড়ী থামিল। তরুণবাবু এবং মিসেস্ সরখেল গাড়ী হইতে নামিয়া টিকিট ঘরের দিকে অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময়ে হোয়াইটওয়ে লেডল'র দোকানের দিক হইতে তরুণবাবুর পিসতুত শ্যালিকা রমা ব্যাগ হাতে হন্ হন্ করিয়া উহাদের সামনে দিয়াই চলিয়া গেলেন। তরুণবাবুর সঙ্গে একবার দৃষ্টি বিনিময় হইল, ক্ষণিকের জন্য। সম্ভবত সঙ্গে অপরিচিতা মহিলা দেখিয়াই রমা দেবী কোন বাক্য ব্যয় না করিয়া সোজা ধর্মতলার দিকে অগ্রসর হইলেন।

সিনেমা দেখা শেষ হইলে তরুণবাবু বলিলেন—চলুন, আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি।

না, থাক, আমি ট্রামেই যাব।

কেন, গাড়ী যখন রয়েছে, কতক্ষণ আর লাগবে ?

বিশেষ ধন্যবাদ। আমি ট্রামেই যাব। আপনাকে আর ট্রাবল দেবো না। নমস্কার !

নমস্কার !

শ্রীমতী কেষ্ট আদর্শনিবাসে ফিরিলেন। ভজহরি বলিল, এত দেরি যে !

মেট্রোয় গিয়েছিলুম।

বেড়ে আফিস তো।

৬

তরুণবাবুর বাড়ী। তরুণবাবু যখন মেট্রোতে ঢুকিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁর সহধর্মিণী সুরমাদেবী রেডিওর চাবি খুলিয়া গান

শুনিতেছিলেন। একটু পরে আউটরামঘাট-প্রত্যাগত প্রতিবেশী ছোকরার ভগিনী স্থলেখা আসিয়া বলিল, মাসিমা, আপনি যে বড় বাড়ীতে বসে ?

কেন ?

মেসোমশায় তো বেড়াতে গেছেন গঙ্গার ধারে !

যাঃ, আজকাল ওঁর কাজ কত বেড়ে গেছে। তাই ফিরতে দেরী হয়। বোস এখানে, গান শোন।

তা শুন্‌ছি। কিন্তু দাদা যে ব'ল্‌লে সে একটু আগে দেখে এসেছে, মেসোমশাই আর—, ইয়ে—, মেসোমশাই গঙ্গার ধারে চা খাচ্ছেন আর বেড়াচ্ছেন।

তা হ'তেও পারে। হয় তো আপিসের পর একটু—

হ্যাঁ, তা তো ঠিক। দাদা ব'ল্‌লে, মানে—, দাদা ব'ললে—

দাদা কি ব'ললে ?

ব'ললে, মানে—ইয়ে—

কি ব'ললে, বল্‌ না।

ব'ললে, মানে, মেসোমশাই গঙ্গার ধারে বেড়াচ্ছিলেন আর চা খাচ্ছিলেন।

এই কথা বলিয়াই স্থলেখা উঠিয়া পলাইয়া গেল।

স্থরমাদেবী রেডিওর চাবি বন্ধ করিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিলেন। বোধ হয় স্থলেখার কথার স্থর ও ভঙ্গীর মধ্যে এমন কিছু ছিল, যাহাতে স্থরমা যেন একটু অস্বস্তি বোধ না করিয়া পারিলেন না। উঠিয়া গিয়া কিছুক্ষণ গোটা কয়েক নিরর্থক কাজ করিয়া ফেলিলেন। দম দেওয়া ঘড়িতে পুনরায় দম দিলেন। পরিষ্কার আয়নাখানি আবার মুছিলেন। ফাইলে গোঁজা পুরোনো চিঠি ও ক্যাসমেমো পড়িয়া দেখিতে লাগিলেন।

ঝিটাকে ডাকিয়া অনর্থক একবার বকিয়া দিলেন। আবার ফিরিয়া আসিয়া রেডিওর চাবি খুলিয়া বসিয়া পড়িলেন।

একটু পরেই সিঁড়িতে খট্ খট্ শব্দ শোনা গেল। পর মুহূর্তেই সম্মুখে উপস্থিত পিস্তুত বোন রমা। সুরমাদেবীর প্রায় সমবয়সী।

সুরমাদেবী বলিলেন, হঠাৎ কি মনে করে?

এই যাচ্ছিলাম এই পথে। ভাবলুম একবার তোর এখানে ঢুঁ মেরে যাই।

তা বেশ করেছিস। বোস, একটু চা ক'রতে বলি।

না, না। চা তো আমি বেশি খাই নে। তা ছাড়া, এই একটু আগেই খেয়েছি। এখন আর কিছু খাব না।

তবে, গান শোন।

তুই যে বড় বাড়ীতে ব'সে ব'সে গান শুনছিস্? জামাইবাবুকে তো দেখে এলাম, মেট্রোয় ঢুকতে।

সুরমাদেবীর মুখ হইতে আপনি বাহির হইয়া গেল, মেট্রোয়?

হ্যাঁ, আশ্চর্য হলি যেন!

না, না। আজকাল ওঁর আপিসের কাজ ভয়ানক বেড়ে গেছে কি না। তাই হয় তো, আপিসের পর একটু—

আমি তো দূর থেকে ভাবলুম, তুইও সঙ্গে রয়েছিস। কিন্তু কাছে গিয়ে দেখলুম—

কি দেখলি?

দেখলুম, মানে—, দেখলুম তুই যাস নি। তবে—

তবে কি?

সঙ্গে আর একজনকে দেখলুম।

কাকে?

আমি চিনি নে।

বোধ হয় আপিসের কোন বন্ধু টন্ধু হবে।

বোধ হয়। আচ্ছা, আমি আজ আসি। তুই তো আর আমাদের ওদিকে মাড়াস নে। যাস একদিন।

যাবো।

রমা চলিয়া গেল। রমার কথাগুলির সুর এবং ভঙ্গীও সুরমাদেবীর পছন্দ হইল না। বেশ একটু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। একবার ভাবিলেন, তরুণবাবু ফিরিলেই একটা হেস্তনেস্ত করিয়া ফেলিবেন। কিন্তু পরক্ষণেই আবার স্থির করিলেন, না এইরূপ সামান্য অছিলায় একটা 'সীন' করা সমীচীন হইবে না। এখন সম্পূর্ণ নীরব ও নিশ্চিন্ত থাকিবেন। স্বামীকে তাহার মনের সন্দেহ কিছুতেই জানিতে দিবেন না। আরো কিছুদিন দেখিয়া পরে যাহা হয় করা যাইবে। এই সঙ্কল্প করিয়া সুরমাদেবী নিজেকে সংযত করিলেন এবং মনের স্বাভাবিক প্রফুল্লতা ফিরাইয়া আনিলেন।

৭

মিঃ ব্যানার্জ্জি বাড়ী ফিরিয়াছেন। সুরমাদেবী অগ্রসর হইয়া গিয়া বলিলেন, তোমার আজকাল বড় দেরি হয় আপিস থেকে আসতে।

হ্যাঁ, কাজ ভয়ানক বেড়ে গেছে। ওয়ারের জন্য জার্মেনি, ইতালি প্রভৃতি দেশের সঙ্গে এক্সপোর্ট ইম্‌পোর্ট সব বন্ধ। যত অর্ডার, তার বেশির ভাগই এসে পড়ছে আমাদের মিস্‌লেনিয়াসে।

তোমাদের ব্যবসা কিসের গো?

মিস্‌লেনিয়াস, মানে—নানারকম।

ও। যাই বল, আজ তোমার বড় দেরি হ'য়ে গেছে। এত দেরি ক'রো না, শরীর খারাপ হবে।

কি করি বল? আমাদের কাজ বেড়ে চলেছে ব'লে সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপিটালও বাড়াতে হচ্ছে কি না! আজই বিকেলে এক মাড়োয়ারীকে আড়াই লাখ টাকার শেয়ার বিক্রী করা হ'ল। সেই সব কাগজপত্র ঠিক করতে করতে—

এত খাটুনির পর একটু বিশ্রামও তো দরকার। আপিসের পর বরঞ্চ একটু যদি গঙ্গার ধারে বেড়িয়ে তার পর বাড়ী ফের, তো মন্দ হয় না।

তরুণবাবু স্বগত বলিয়া ফেলিলেন, গঙ্গার ধারে! বলে কি!—পরে গৃহিণীকে বলিলেন, হ্যাঁ, তা মন্দ হয় না। তবে কি জান, আপিসের ছুটী হ'লেই বাড়ীতে এসে পৌছানর জন্য মনটা ছট্‌ফট্‌ ক'রে ওঠে।

তা করুক। তাই ব'লে তো শরীরটা মাটি করা যায় না। এত খাটুনি, তার পর একটু বিশ্রাম না ক'রলে চলবে কেন? বরঞ্চ এক আধ দিন আপিসের কাউকে সঙ্গে ক'রে একটু সিনেমা দেখে এসো। তোমার কাজের যে ভীষণ চাপ পড়েছে, তাতে সময়মত বাড়ী ফিরে আমাকে নিয়ে বেরোনো—সে তো এখন হ'য়ে উঠ্‌বে না—

তরুণবাবু মনে মনে বলিলেন, ব্যাপার কি? গঙ্গার ধার, সিনেমা—। প্রকাশ্যে বলিলেন, হ্যাঁ—তা মন্দ কি? তবে কি না, তুমি সঙ্গে না গেলে আমার ছবি দেখাই হয় না।

তাই নাকি গো! আমার জন্য বুঝি ফুল এনেছ? পকেটে বুঝি? কেমন সুন্দর গন্ধ বেরুচ্ছে!

ফুল! পকেটে! গন্ধ বেরুচ্ছে! মানে, ভুলে ট্রামে লেডিজ সীটে বসে পড়েছিলাম কি না—। কিংবা বোধ হয়—মানে, ওই যে

মাড়োয়ারিটা সাড়ে চার লাখ টাকার শেয়ার কিনলে, তাকে একটা পার্টি দেওয়া হ'ল কি না—সেখানে আতর, গোলাপ জল, কত কি—বোধ হয়—

নাও, হয়েছে! এখন কাপড়চোপড় ছেড়ে খাবে চল। রাত হয়েছে।

৮

কিছুদিন পরে। মিসলেনিয়াস ওয়ার্কার্স আপিস। মিঃ ব্যানার্জির ঘর। তরুণবাবু ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, শ্রীমতী তাঁহার পূর্বেই আসিয়া স্বস্থানে বসিয়াছেন। টুপি এবং ছড়ি যথাস্থানে রাখিয়া তরুণবাবু নিজ চেয়ারে বসিয়া লক্ষ্য করিলেন, শ্রীমতী কাঁদিতেছেন। তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গিয়া রুমাল বাহির করিয়া শ্রীমতীর চোখ মুছাইয়া দিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার পিছনের দিকে সুইংডোর খুলিয়া কয়েকজন অ্যাসিষ্টাণ্ট এবং কেরাণি তরুণবাবুর অলক্ষ্যে নানাবিধ নীরব মুখভঙ্গী করিতে লাগিলেন। শ্রীমতী দেখিয়াও দেখিলেন না।

তরুণবাবু বলিলেন, কি হয়েছে আপনার? কাঁদছেন কেন?

শ্রীমতী আরও ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তরুণবাবু রুমাল দিয়া ক্রমাগত চোখ মুছাইতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে দৈবাৎ একবার পিছনের দিকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়া উঠিলেন, কোথা গেল দরওয়ানটা। এই বেয়ারা—

বেয়ারা আসিয়া উপস্থিত হইল। তরুণবাবু চটিয়া বলিলেন, তুমলোক কেয়া করতা হায়? টেবিল পর সিগারেটকা ছাই সাফা নেহি করতা হায়, আর ওহি ছাই উড়কে উড়কে মেমসাহেবকা আঁখমে চলা যাতা হায়—

এই কথা বলিয়া রাগে গর গর করিতে করিতে তরুণবাবু নিজ চেয়ারে বসিলেন এবং অ্যাসিস্ট্যাণ্টদিগকে বলিলেন—দেখুন, কনফিডেন্সিয়াল ফাইলটা—এটা এখানে রেখে যান। এই ফাইলটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনারা কেউ এঘরে আসবেন না। আমার এটা শেষ করতে প্রায় ঘণ্টা দুই লাগবে।

অ্যাসিস্ট্যাণ্টগণ চলিয়া গেলেন।

তরুণবাবু শ্রীমতীকে ডাকিয়া বলিলেন, এখানে আসুন। হ্যাঁ, বসুন। এবার বলুন, আপনার কি হয়েছে।

আপনাকে বলে লাভ কি ?

তবু, বলুন না।

আমাদের বাড়ীওয়ালা আজ ইজেক্টমেণ্টের নোটিশ দিয়েছে। আমাদের দাঁড়াবার স্থান নেই।

কেন, আপনার স্বামী ত—

তিনি আজ তিন বছর বেকার। ওঁর একটা চাকরি না হ'লে আমাদের মান মর্যাদা দূরে থাক, কলকাতায় দুবেলা দুটো—

আচ্ছা, আমি দেখছি, কি ক'রতে পারি।

যদি দয়া করে আপনার আপিসেই একটা কাজ দেন—

দেখুন, সেটা আমার খুব পছন্দ নয়। মানে, একই আপিসে স্বামী-স্ত্রী। ওতে কাজের ক্ষতি হবে। বরঞ্চ দেখছি, আমার জানা একটা ফার্মে ঢুকিয়ে দিতে পারি কি না।

দয়া ক'রে একটু বিশেষ চেষ্টা ক'রবেন কিন্তু।

নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই।

তা'হলে এখন যাই, চিঠি সর্ট করি গে।

আচ্ছা—যান।

৯

ভজহরির চাকরি হইয়াছে। আদর্শ-নিবাস ছাড়িয়া উহারা স্থরুচি-আশ্রমে উঠিয়া আসিয়াছে। ধরা পড়িবার ভয়ে এক হোটেলে বেশিদিন থাকিতে উহাদের সাহস হয় না।

রবিবার। আপিস নাই। আহারাদির পর কেষ্ট বলিল, আর কেন, এইবার আমাকে ছেড়ে দিন। শেষে কি জেলে যাব? আর দুদিন আদর্শ-নিবাসে থাকলেই ধরা পড়ে যেতাম। ওখানকার ম্যানেজারের শ্যালকটি যেভাবে আমার পিছু নিয়েছিল—

আর কটা দিন একটু ধৈর্য ধরে থাক। আমার প্রোবেশনারি পিরিয়ডটা উৎরে যাক। কি জানি বাপু, এর মধ্যে আবার কি ক'রে বসে।

প্রোবেশনারি পিরিয়ডও শেষ হইল। ভজহরির বেকারত্ব সত্যই ঘুচিল! কম হউক, বেশি হউক, মাস অন্তর কিছু তো আসে। আর নরহরির ফ্রেণ্ড হইতে হইবে না। ফ্রেণ্ডস্ চার্জের জন্য আর নরহরিকে মেসের ম্যানেজারের তাড়া খাইতে হইবে না। রাত্রে খাইবার পরে একটা মিঠে পানের অভাব হইবে না।

ভজহরি কেষ্টকে রেহাই দিল। কেষ্ট আর আপিস গেল না।

তরুণবাবু একদিন ভজহরিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ভজহরি অতি ভারাক্রান্ত বিষণ্ণমুখে আপিস-ঘরে প্রবেশ করিল। তরুণবাবু বলিলেন, আপনার স্ত্রী আজ কয়দিন আসেন নি। অসুখ-বিসুখ করে নি তো! কোন খবরও তো দিলেন না!

ভজহরি হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

তরুণবাবু শশব্যস্তে বলিলেন, ব্যাপার কি?

ভজহরি কাঁদিতে কাঁদিতেই বলিল, আমার সর্বনাশ হয়েছে, সার্।

সে সর্বনাশী আমার সর্বনাশ ক'রে গেছে। উঃ কি ভীষণ কলেরা— একেবারে এশিয়াটিক কলেরা, সার্।

তরুণবাবু সান্তনা দিয়া বলিলেন, যা হবার হ'য়ে গেছে। কেঁদে আর কি করবেন। নিয়তিকে কেউ বাধা দিতে পারে না।

ভজহরি কাঁদিতে কাঁদিতেই বাহির হইয়া গেল।

১০

মুস্কিল হইল কেষ্টকে লইয়া। ভজহরি স্বীয় মেসে নরহরির ঘরে সীট লইয়াছে। কেষ্ট একে তো যাত্রাদলের সখী। তারপর গত কয়েক মাস যাবৎ ইলেক্‌ট্রিক পাখার বাতাস, মোটরে ভ্রমণ, হোটেলে খাওয়া, সিনেমা দেখা এবং অন্যান্য নানাবিধ আদর যত্নে খাঁটি থিয়েটার-বাবুতে পরিণত হইয়াছে। এখন তাহার পক্ষে আর মেসের ত্রিশজন মেম্বারের খাটুনি খাটা সম্ভব নয়। অথচ একটা কিছু চাই তো! ভজহরিরও একটা ময়্যাল রেস্‌পন্সিবিলিটি আছে। সে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কেষ্টকে বলিল, ভদ্রলোকের বাড়ীতে কাজ করবি? ছোট পরিবার, বেশি ঝামেলা নেই।

কেষ্ট অগত্যা বলিল, আচ্ছা।

পরদিন আপিস যাইবার সময়ে একটু দেরি করিয়াই মেস হইতে বাহির হইল। কেষ্টকে সঙ্গে লইয়া তরুণবাবুর বাড়িতে উপস্থিত হইল। তরুণবাবু তখন আফিসে চলিয়া গিয়াছেন। কয়েকদিন পূর্বে তরুণবাবু ভজহরিকে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার চাকরটা দেশে চলিয়া গিয়াছে। যদি তাঁহার জানা বা তাঁহার কোন বন্ধুর জানা ভাল চাকর থাকে, তাহা হইলে যেন তাঁহার বাসায় পাঠাইয়া দেন। ভজহরি তাই কেষ্টকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া তরুণবাবুর ঠাকুরকে ডাকিয়া বলিল, বাবু আমাকে

একটা চাকরের কথা বলেছিলেন। এই লোক দিয়ে গেলাম। মাইজিকে ব'লো, এ কাজকর্মে খুব ভাল।

ঠাকুর মাইজিকে সংবাদ দিল। চাকর অভাবে বাড়ীতে খুবই অসুবিধা হইতেছিল। মাইজি বলিলেন, ওকে ব'লো—এখন থেকেই থাকতে।

কেষ্ট কাজে ভর্তি হইল।

যাত্রার দলে এবং ব্যবসায়-অফিসে যে সর্বাঙ্গসুন্দর অভিনয়ে অভ্যস্ত, গৃহস্থ-ঘরের বিশ্বস্ত চাকরের অভিনয় তাহার পক্ষে খুবই সহজ। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কেষ্টর কাজকর্ম চালচলন দেখিয়া সুরমাদেবী মুগ্ধ হইয়া গেলেন।

তরুণবাবুর আপিসের কাজ আজকাল কমিয়া গিয়াছে। প্রত্যহ ঠিক পাঁচটায় বাড়ী ফেরেন।

আজও ফিরিয়াছেন। সুরমাদেবী বলিলেন, একটা চাকর-রত্ন পেয়েছি।

কলকাতার চাকর-রত্ন! তোমার ধনরত্নগুলো সাবধান।

সে ভয় নেই। চেনা লোক। ভজহরিবাবু দিয়ে গেছেন। কাজকর্ম কি নিখুঁত, আর কি পরিষ্কার! মনেই হয় না যে চাকর!

কই, ডাক তো দেখি তোমার রত্নটাকে—

কাপড় চোপড় ছেড়ে মুখ হাত ধুয়ে নাও। ও আসছে চা আর খাবার নিয়ে।

তরুণবাবু প্রস্তুত হইলে সুরমাদেবী ডাকিলেন, কেষ্ট!

আজ্ঞে!

চা আর খাবার নিয়ে আয়।

যাই মা।

কেষ্ট চা এবং খাবার লইয়া তরুণবাবুর সম্মুখে আসিয়াই হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহার হাত কাঁপিতে লাগিল। চায়ের বাটি এবং

খাবারের থালা মাটিতে পড়িয়া গেল। পরক্ষণেই কেষ্ট ছুটিয়া সেখান হইতে পলাইল।

এদিকে তরুণবাবু কেষ্টকে দেখিয়াই 'ওঃ' বলিয়া চেয়ারের উপর এলাইয়া পড়িলেন। একটু পরে ঠাকুরকে ডাকিয়া ধরাধরি করিয়া স্থরমা দেবী তাঁহাকে বিছানায় শোওয়াইয়া দিলেন।

কিছুক্ষণ পরে তরুণবাবু প্রকৃতিস্থ হইয়া স্থরমাদেবীকে সব কথা খুলিয়া বলিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। স্থরমাদেবী বলিলেন, এই ধরণের একটা কিছু আমি অনেক আগেই সন্দেহ ক'রেছিলাম। কিন্তু তোমাকে আমি ভাল ক'রেই চিনি, তাই কিছু বলিনি। আমি জানি, বেশি কোন অন্যায় তুমি ক'রতে পার না।

তরুণবাবু আবার বলিলেন, আমায় ক্ষমা কর।

স্থরমাদেবী বলিলেন, যাও, তুমি ভারি ছেলেমানুষ!

তরুণবাবু বলিলেন, ওই ভজহরিটা কি রাস্কেল! ওকে আমি জেলে দেবো।

থাক। আর বীরত্বে কাজ নেই। তাছাড়া, বেচারী—পেটের দায়ে—কি আর এমন অন্যায় ক'রেছে?

যা করবার তা তো করেছে! তার পর আবার কেষ্টকে আমাদেরই বাড়িতে পাঠানোর মানে?

আর কোনো মানে থাক বা না থাক, এতে তোমার আর আমার দুজনেরই মনের অস্বস্তিটা যে কেটে গেল, এটা কি কম লাভ?

এই কথা বলিবার পর স্থরমাদেবী কেষ্টকে ডাকিলেন; কেষ্ট সভয়ে সামনে আসিয়া দাঁড়াইল এবং গলবস্ত্র হইয়া মিস্টার ব্যানার্জি এবং স্থরমাদেবীকে প্রণাম করিল।

পাইলট

ভজহরির অফিস উঠিয়া গিয়াছে। বহু কষ্টে যে চাকুরিটি জুটিয়াছিল, তাহা চলিয়া গেল। অথচ ভজহরির কোন দোষ নাই। অদৃষ্ট এবং কর্মফল সম্বন্ধে মনে মনে গবেষণা করিতে করিতে ভজহরি তদীয় বন্ধু নরহরির মেসে গিয়া উঠিল। নরহরি সংক্ষেপে বলিল, আবার বেকার ?

ভজহরি সংক্ষেপে উত্তর দিল, হুঁ।

এবার কি করবি, ভাবছিস্ ?

ভাবছি না কিছুই। তবে, তোর দেনাটা—

থাম্। আমার দেনার কথা ভাব্তে হবে না।

একটা কথা ভাবছি।

কি ?

আকাশে উড়্ব। অর্থাৎ, পাইলট হব।

কাজটা বড় বিপজ্জনক। আমার মন সরে না।

হোক গে বিপজ্জনক। বিপদে আমার ভয় কি ? আমার তো কোন দিকেই কোন টান নেই—এক তুই ছাড়া। তা, যদি মরেই যাই, না হয় একটু কাঁদবি। তুই আর আমাকে বাধা দিস নে। আমি শীগগিরই সব ঠিক করে ফেল্‌ছি। কিছু খরচপত্রের দরকার। তা এবার আর তোকে বিরক্ত কর্‌ব না।

ভাল করে ভেবে দেখ, কাজটা কিন্তু বড় রিস্‌কি।

তা হোক। কোন রিস্‌ক আমি গ্রাহ্য করি নে।

২

ভজহরির এক মাসী থাকেন বিবেকানন্দ রোডে। অবস্থা ভাল। ভজহরি বড় একটা সেখানে যাতায়াত করে না। বছরে হয় তো দুই একবার যায়, একটু জল খাইয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া আসে।

ভজহরি স্থির করিল, মাসীর কাছে কিছু ধার করিবে। পরে পাইলটের লাইসেন্স লইয়া যখন চাকুরি করিবে, তখন শোধ করিয়া দিবে।

মাসির বাড়ি গিয়া ভজহরি সটান মাসীমাকে গিয়া প্রণাম করিল। মাসী বলিলেন, কি রে, কি মনে করে? ভাল আছিস্ তো?

হ্যাঁ, ভালই আছি। তোমাদের ভজা আর মন্দ থাক্‌ল কবে?

বেশ, ভাল থাকলেই ভাল। বস একটু। ধোপা এসে বসে আছে। কাপড় চোপড়গুলো লিখে দিয়ে আসছি।

বেশ তো, এসো।

মাসিমা কাপড় লিখিয়া শেষ করিয়া মিলাইবার সময়ে দেখেন ধোপার গোনার সঙ্গে তাঁহার খাতার অঙ্ক মিলিতেছে না। দুই তিন বার চেষ্টা করিবার পর, বিরক্ত হইয়া খাতা আনিয়া ভজহরির নিকট ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, দেখ তো বাপু—আমি তো কিছুতেই মেলাতে পারছি নে। ভজহরি খাতা হাতে করিয়া ধোপাকে বলিল, কাপড়গুলো সব আলাদা করে ফেল। আমি এক এক করে সবার কাপড় মিলিয়ে দিচ্ছি। ধোপা এক এক জনের কাপড় পৃথক্ পৃথক্ করিয়া স্তূপ করিল, ভজহরি মিলাইতে লাগিল। কাহারও সাড়ী সাতখানা, কাহারও দুখানা; কাহারও রুমাল আটখানা, কাহারও একখানা; কাহারও তিনটা পাঞ্জাবী, একবারের বেশী পরা বলিয়া মনে হয় না, কাহারও অত্যন্ত ময়লা সার্ট মাত্র একটি; কাহারও ব্লাউজ পাঁচটি, কাহারও একটি ময়লা

সেমিজ; ইত্যাদি। কাপড় ধোপার হিসাবের সহিত মিলিয়া গেল। মাসীমাকে খাতা ফিরাইয়া দিয়া ভজহরি বলিল, এই নাও তোমার খাতা। দেখ, আমি আজ দশ বছর তোমাদের বাড়ী আসছি, কিন্তু তুমি ছাড়া বাড়ীর কারো সঙ্গে তেমন একটা পরিচয় হয় নি। কিন্তু আজ তাদের কাপড় মেলাতে গিয়ে তাদের আর্থিক অবস্থা, অভ্যাস, রুচি প্রভৃতির যে পরিচয় পেলাম, তা বোধ হয়, আরো দশ বছর এ বাড়ীতে আসা যাওয়া করেও পেতাম না। সে যাক্। আচ্ছা, ওর মধ্যে দেখ্‌লাম, দুখানা অত্যন্ত ময়লা তেলচিটে আটপৌরে থানধুতী। ও দুখানা কার?

কার আবার! ওই পোড়াকপালী বেলার।

বেলা কে, মাসিমা?

ওই তো আমার বড় ননদের সেজ মেয়ের মেজ মেয়ে। আহা, হবার পরদিনই মা হারাল। বিয়ের পরদিনই বিধবা হ'ল। কোথাও দাঁড়াবার ঠাঁই পেল না। কি কর্‌ব? এখানেই এনে রেখেছি।

ধোপার কাপড়ের নমুনা দেখিয়া ভজহরি নিঃসংশয়ে বুঝিল, দয়াময়ী মাসিমার বাড়ীতে একটি ঝির স্থান পূর্ণ করিয়াছে পোড়াকপালী বেলা। ইতিমধ্যে দেখা গেল, উক্ত পোড়াকপালী একখানি সাদা ধবধবে ধুতী পরিয়া দোতালার একখানি ঘর হইতে বাহির হইয়া সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেল। ভজহরি দেখিল, পোড়াকপালী হইলেও বেলা সুন্দরী ষোড়শী। হাতে দুইগাছি করিয়া সরু সোনার চুড়ি, গলায় একটি সরু মফ-চেন, পিঠের উপর একরাশ কালো চুল।

ভজহরি যেন একটু অন্যমনস্কভাবেই জিজ্ঞাসা করিল, মাসীমা, বেলা বিধবা হ'ল কেন?

শোন কথা! বিধবা হবার আবার কারণ থাকে না কি? কপাল—

ভজহরি মাসীমার নিকট আসল কথা পাড়িল এবং অনেক বুঝাইয়া সুঝাইয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া মাসীমাকে প্রণাম করিল। বলিল, দেখ না, আমি দু' তিন মাসের মধ্যেই পাইলট হ'য়ে তোমার টাকা ফিরিয়ে দেব।

তা দিস। মাঝে মাঝে আসিস্ কিন্তু—

নিশ্চয়ই আস্‌ব।

৩

ভজহরি এখন প্রায়ই আসে মাসীমার সঙ্গে দেখা করিতে। একদিন মাসীবাড়ি পৌছিয়া দোতলায় উঠিবার পথে সিঁড়ির উপরে বেলার সঙ্গে দেখা। একটি কুঁজা কাঁখে করিয়া বেলা নীচে নামিতেছিল। ভজহরি উপরে উঠিবার সময়ে কুঁজার গায়ে সামান্য একটু ধাক্কা লাগিয়া গেল।

ভজহরি পাইলট-গিরি শিখিতে যায়, ভায়া মাসীর বাড়ি। পাইলট-গিরি শিখিয়া ফিরিয়া বাসায় যায়, ভায়া মাসীর বাড়ি।

বেলা আগের চেয়ে যেন চঞ্চল হইয়াছে বেশী, কাজকর্ম করে বেশী, মাসীমাকে ভালবাসে বেশী, চুল বাঁধে বেশী, ছাদে যায় বেশী।

ভজহরি যখনই আসে, মাসীমার সঙ্গে গল্প করে, চা খায়, এরোপ্লেন-চালানোর কৌশল সম্বন্ধে বক্তৃতা করে। ফিরিবার সময়ে রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর কিংবা কলতলার দিক দিয়া একটু ঘুরিয়া যায়। ইচ্ছা করিয়া হঠাৎ বেলার সম্মুখে পড়িয়া যায়। কখনও দু একটা কথা হয়, কখনও হয় না।

কিছুদিন পরে। ভজহরি মাসীমার সঙ্গে দেখা করিয়া ফিরিবার সময়ে রান্নাঘরের পাশে বেলার সহিত সাক্ষাৎ হইতেই, ভজহরি বলিয়া ফেলিল, আমি চাকরি পেয়েছি। আমি তোমাকে এমন করে আর ঝি-গিরি করতে দেব না।

বেলা বলিল, তার মানে ?

মানে আর একদিন বল্‌ব—বলিয়া ভজহরি বাহির হইয়া গেল।

আর একদিন। মাসীমার সহিত সাক্ষাতের পর বেলার সহিত সাক্ষাৎ হইতেই কিছুক্ষণ ধরিয়া ফিস্‌-ফিস্‌ ফুস্‌-ফাস্‌ চলিল। বড় বৌএর পায়ের শব্দ শুনিতেই ভজহরি আস্তে আস্তে বাড়ির বাহির হইয়া গেল।

বেলাকে ছাদে পাইয়া বসিয়াছে। চুল শুকাইতে ছাদে যায়, কাপড় মেলিতে ছাদে যায়, একবার গেলে আর শীঘ্র ফিরিতে চায় না। মাথার উপর দিয়া গোঁ গোঁ করিয়া এরোপ্লেন ওড়ে, বেলা চাহিয়া চাহিয়া দেখে। বৈকালে চিরুণী হাতে এলো চুলে ছাদে যায়, ঘুরিয়া ঘুরিয়া চুল আঁচড়ায়, আর কেবলই আকাশের দিকে তাকায়। মাসীমার ইচ্ছা, খুব বকেন, খুব শাসন করেন ; কিন্তু বেলা ইদানীং মাসীমার সেবাযত্নের মাত্রা এত বাড়াইয়া দিয়াছে যে মাসীমা কোন কথা বলিবার অবসরই পান না। বরং বাড়ির অপর কেহ কিছু বলিলে বলেন, আহা! ছেলেমানুষ বই তো না। কিই বা বয়েস!

একদিন দুপুরে সকলের আহারাদির পর বেলা বলিল, মাসিমা, তোমার আমসত্বের হাঁড়িটা দাও তো, রোদে দিয়ে আসি। আমসত্বগুলো রোদ অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যা কাকের উৎপাত। আমাকেই বসে বসে পাহারা দিতে হবে আর কি ?

থাক না এখন। এই তো রান্নাঘর থেকে বেরুলে। একটু জিরিয়ে নাও।

না মাসীমা, তোমার আমসত্বগুলো নষ্ট হবে আর আমি শুয়ে থাক্‌ব, সে কি হয় ?

কর গে বাপু, যা খুসী—বলিয়া মাসীমা একটু গড়াইতে গেলেন।

বাড়ীর অপর সকলেও, কেহ বাহিরে চলিয়া গিয়াছে, কেহ ঘরে বিশ্রাম করিতেছে।

বেলা ধুতী ছাড়িয়া ছোট বউয়ের আলনা হইতে একখানা চেক শাড়ী লইয়া পরিয়া ফেলিল এবং আমসত্বের হাঁড়ি লইয়া ছাদে গিয়া একপাশে হাঁড়িটি নামাইয়া রাখিয়া, আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। দূরে একখানি এরোপ্লেনের শব্দ শুনিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইয়া আঁচলটা শক্ত করিয়া কোমরে জড়াইয়া লইল! এরোপ্লেনখানি ক্রমশঃ যেন নীচের দিকে নামিয়া আসিতেছে। ক্রমে ক্রমে যখন প্রায় বেলাদের বাড়ীর নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে, তখন দেখা গেল, এরোপ্লেনখানির নীচে একটি লম্বা দড়ি ঝুলিতেছে, দড়ির আগায় একটি মোটর-গাড়ীর টায়ার বাঁধা রহিয়াছে। আরো নিকটে আসিতেই এরোপ্লেনের শব্দটা যেন ক্ষণেকের জন্য বন্ধ হইয়া গেল, টায়ারটি ক্রমশঃ নীচে নামিয়া আসিতে লাগিল। টায়ারটি ছাদের উপর আসিয়া পড়িতেই বেলা চট্‌ করিয়া টায়ারটির ফাঁকের মাঝে ডান পা ঢুকাইয়া দিয়া বসিয়া পড়িল এবং দুই হাতে জোরে সামনের দিকে টায়ারটিকে জড়াইয়া ধরিল। ইতিমধ্যে এরোপ্লেনের এঞ্জিন আবার গোঁ-গোঁ আরম্ভ করিয়াছে। বেলা ক্রমশঃ মুক্ত আকাশে উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে।

দড়িটি ক্রমশঃ ছোট হইতে লাগিল, অর্থাৎ ভজহরির এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট এরোপ্লেন হইতে ক্রমশঃ দড়িটিকে টানিয়া তুলিতে লাগিল। বেলা দুলিতে দুলিতে টায়ার-সহ এরোপ্লেনে পৌছিল। বেলাকে টানিয়া তুলিয়া পাইলট ভজহরির ঠিক পিছনের সীটে বসান হইল। এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট মহাশয় আর একটু পিছনে সরিয়া আসিয়া টায়ারের দড়ি কাটিয়া দিলেন।

টায়ারটি আসিয়া পড়িল দেশপ্রিয় পার্কে। আকাশ হইতে টায়ার পড়িতে দেখিয়া নিকটবর্তী অঞ্চল হইতে লোক ছুটিল কাতারে কাতারে।

কেহ বলিল, নূতন টাইপের একটা বোমা পড়িয়াছে। কেহ বলিল, বোমা নয়, বোমার খোল। দূর হইতে অতি সন্তর্পণে বড় বড় হোস দিয়া জল ছিটান হইল। পরে একখানি লরীতে উঠাইয়া সামরিক যন্ত্র-বিশারদগণের নিকট পরীক্ষার্থ পাঠান হইল।

৪

এদিকে এরোপ্লেনে উঠিয়া বেলা ভজহরির পিঠ ঘেঁষিয়া বসিল। তাহার উষ্ণ নিঃশ্বাস ভজহরির কাঁধে সুড়সুড়ি দিতে লাগিল।

ভজহরি বলিল, কেমন লাগছে ?

খুব ভাল।

জানালা দিয়ে নীচের দিকে চেয়ে দেখ। ওই দেখ গঙ্গা, ওই দেখ কালীঘাটের গঙ্গা। ওই দেখ ঘর বাড়ীগুলো কেমন দেখাচ্ছে। ওই ক্ষেতের আলগুলি কেমন দেখাচ্ছে, যেন সবুজ রঙের চেক-শাড়ী। ওই দেখ জাহাজগুলো কেমন ছোট ছোট নৌকার মত দেখাচ্ছে। চাহিয়া চাহিয়া বেলা মুগ্ধ হইয়া গেল।

এরোপ্লেনের নাক এবং ভজহরির চোখ হরাইজন্‌ লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, মাঝে মাঝে উপরে ওঠার জন্য একটু দোলা লাগিতেছে, একটা অস্পষ্ট গোঁ-গোঁ শব্দ কানের সঙ্গে জুড়িয়া রহিয়াছে আর আরব্য উপন্যাসের ম্যাজিক কার্পেটের মত অনন্তের পথে আনন্দে ভাসিয়া চলিয়াছে—ভজহরি এবং বেলা। সম্মুখে ডায়ালে উচ্চতার কাঁটা আগাইয়া চলিয়াছে, তিন হাজার ফিট, চার হাজার ফিট, পাঁচ হাজার ফিট, বেলা আশ্চর্য হইয়া নীচের পৃথিবীর ছবির দিকে চাহিয়া আছে। আট হাজার ফিট উপরে উঠিতেই বেলার শীত করিতে লাগিল। বলিল, আর উপরে উঠো না, বড় শীত করছে। আগে জানলে গরম জামা পরে আসতুম।

এ আর শীত কি ? এতো প্রায় দার্জিলিংএর মত উঁচুতে উঠেছি। আমাদের বিশ-পঁচিশ হাজার ফিটও উঠতে হয়।

ওরে ব্বাপ্। আজ তাই বলে আর উঠো না। আমি তাহলে শীতে জমে যাব।

হঠাৎ ভজহরি একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। বেলাকে বলিল, চুপ্। কিছুক্ষণ মাথায় ও কানে বাঁধা বেতার শব্দ গ্রহণের যন্ত্রে মনোনিবেশ করিয়া বলিল, মাটি করেছে !

কি হ'লো ?

বেতারে হুকুম এলো, আমাকে এখনই অন্যদিকে দূরে যেতে হবে, দরকারী কাজে।

কি কাজ ?

কাউকে বলা নিষেধ।

আমাকেও বলবে না ?

না, কাউকে না।

ইতিমধ্যে উহারা সমুদ্রের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। সমুদ্রতীরের অপূর্ব দৃশ্য দেখিয়া বেলা মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে। বিশাল নীল জলের রাশি, অগণিত ঢেউ, তীরভূমিতে সাদা ফেনের রাশি মাথায় করিয়া ঢেউয়ের পর ঢেউ আছাড় খাইয়া পড়িতেছে, যেন নীল শাড়ীর রূপালী জরির পাড় সূর্যের আলোয় ঝলমল করিতেছে। বেলা সমুদ্র হইতে দৃষ্টি তুলিয়া আনিয়া ভজহরিকে বলিল, আমাকেও নিয়ে চল না।

সে হয় না। চল, তোমাকে চট্ করে কলকাতায় রেখে আসি। তবে আমি কিন্তু এরোপ্লেন নামাতে পারবো না। তোমাকে প্যারাসুটে নামিয়ে দেবো।

এরোপ্লেনের মুখ ঘুরাইয়া বোঁ করিয়া ভজহরি কলিকাতায় ফিরিল।

পিছনের অ্যাসিষ্টাণ্টকে বলিল, বেলার পিঠে প্যারাসুট বেঁধে দাও। প্যারাসুট বাঁধা হইল। দুইটি চওড়া ফিতা দুই বগলের নীচে দিয়া ঘুরাইয়া বাঁধা হইল, আর একটি চওড়া শক্ত বেল্ট বুকের উপর দিয়া বাঁধা হইল। তারপর বুকের মাঝখানে একটি গোল বোতাম দেখাইয়া বেলাকে বলা হইল, এইবার এই ফাঁক দিয়ে লাফিয়ে পড়। এরোপ্লেন থেকে বেরিয়েই এই বোতামটা টিপে দেবে। তাহলেই প্যারাসুটটা ছাতার মত খুলে যাবে।

৫

বেলা প্যারাসুট ধরিয়া লাফাইয়া পড়িল। ভজহরি এরোপ্লেনের হাল ঘুরাইয়া গন্তব্যস্থানে চলিয়া গেল।

বেলা প্যারাসুটে নামিতেছে। ক্রমশ পৃথিবীর ছবিটা স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইতেছে। বাতাসের চাপে পরণের শাড়ী ফুলিয়া উঠিতেছে। উহার নামিবার কথা দেশপ্রিয় পার্কে। কিন্তু বাতাসের জোরে ভাসিতে ভাসিতে ক্রমশঃ লেকের পাড়ে আসিয়া পড়িল। আকাশ হইতে প্যারাসুট নামিতে দেখিয়া এ অঞ্চলে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। লোক ছুটিল, গাড়ী ছুটিল, লরী ছুটিল, মোটর গাড়ী ছুটিল, মোটর বাইক ছুটিল। কেহ বলিল, এ নিশ্চয়ই জাপানী, এখনই গুলী কর। কেহ বলিল, না, যখন মাত্র একজন, তখন জ্যান্ত বন্দী করাই ভাল। এত লোকের মধ্যে একা, পালাতে পারবে না। সুতরাং গুলী না করাই স্থির হইল।

একটু পরে, মাটির কাছে আসিতে একজন বলিয়া উঠিল, যেন মেয়েমানুষ বলে মনে হচ্ছে।

আর একজন তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, ওটা ক্যামুফ্লেজ।

বেলা মাটিতে পা দিল। প্যারাস্থটটা আস্তে আস্তে তাহার পিছনে মাঠের উপরে এলাইয়া পড়িল। চারিদিকে সমবেত জনতা অতি-সন্তর্পণে একটু একটু করিয়া বেলার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

বেলা প্রথমে একটু ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া পরক্ষণেই আত্ম-সমর্পণের ভঙ্গীতে দুই হাত তুলিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল এবং বলিল, তোমাদের চোখ নেই? দেখতে পাচ্ছ না, আমি মেয়ে মানুষ?

জনতার মধ্যে একজন বলিল, গলার স্বরটা কিন্তু মেয়েলী-মেয়েলী। আর একজন বলিল, "হ্যাঁ, বেশ মিষ্টি-মিষ্টি। জনমণ্ডলীর বৃত্ত ক্রমশ ছোট হইতে হইতে একেবারে বেলার নিকটে আসিয়া পড়িল। তখন একজন বলিল, এ নিশ্চয়ই স্ত্রীলোক।

বেলা বলিয়া উঠিল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি স্ত্রীলোক, বাঙালী স্ত্রীলোক। আপনারা সরুন। আমাকে যেতে দিন।

এই কথা বলিতেই জনতার ভিতর হইতে দুই ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া আসিয়া বেলাকে ধরিয়া মোটর লরীতে উঠাইয়া লইয়া টালিগঞ্জ থানায় জমা করিয়া দিল—তদন্ত ও সনাক্ত করিবার জন্য। আর একজন প্যারাস্থটটি গুটাইয়া ভাঁজ করিয়া মোটরসাইকেলের পিলিয়নে বাঁধিয়া লইয়া অন্তর্হিত হইল। জনতা আস্তে আস্তে সরিয়া গেল। সমস্ত অঞ্চল নানাপ্রকার গবেষণায় মুখর হইয়া উঠিল।

সন্ধ্যার সময়ে ভজহরি নিজের কর্তব্য শেষ করিয়া এরোপ্লেনখানি যথাস্থানে রাখিয়া পাইলটের পোষাক পরিয়াই মাসীমার বাড়ীর দিকে ছুটিল। দোতলায় উঠিয়া মাসিমাকে সম্মুখে পাইয়াই জিজ্ঞাসা করিল, বেলা কই?

কেন, এসেই, বেলা কই, মানে?

না, এমনি!

এমনি ! আমি তোকেই জিজ্ঞাসা করছি, বেলা কই ? দুপুরে মেয়ে ছাদে গেল আমসত্ত্ব রোদে দিতে। আমসত্ত্বর হাঁড়ি যেমন তেমনি পড়ে আছে, মেয়ের আর দেখা নেই। ও বাড়ীর হিরু বল্‌ছিল, সে নাকি দেখেছে, বেলা আকাশে উড়ে যাচ্ছে। কি কাণ্ড! আমি তো কিছুই বুঝ্‌তে পারছি নে।

ভজহরি মাসীমার বাড়ী হইতে বাহির হইয়া নিকটবর্তী থানায় গিয়া কলিকাতার বিভিন্ন থানায় টেলিফোন করিতে লাগিল। টালিগঞ্জে ফোন করিতেই বেলার সন্ধান পাইয়া তৎক্ষণাৎ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। থানার কর্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, কি চাই ?

বেলাকে চাই।

বেলা কে ?

আজ বিকেলে যিনি প্যারাস্থটে ক'রে লেকের ধারে নেমেছেন।

থানার কর্তা ভিতর হইতে বেলাকে লইয়া আসিয়া ভজহরিকে দেখাইয়া বলিলেন, ইনি ?

হ্যাঁ।

ইনি আপনার কে ?

ইনি আমার স্ত্রী।

কপালে সিন্দুর নেই কেন ?

আজ দুপুরে সাবান মেখেছিলেন, তার পরে আর চুল বাঁধবার সুযোগ পান নি।

আপনার স্ত্রী, তার প্রমাণ ?

এই কথা শুনিয়াই বেলা তাহার গলার মফ-চেন টানিয়া বাহির করিয়া তাহার লকেটের ডালা খুলিয়া ভজহরির ফটো দেখাইয়া দিল।

থানার কর্তা বেলাকে মুক্তি দিলেন।

ভজহরি ট্যাক্সি ডাকিল। ট্যাক্সিতে বসিয়া ভজহরি জিজ্ঞাসা করিল, ও লকেটে আমার ফটো রাখ্‌লে কি করে?

তোমার মাসিমার একটা বাক্সে একখানা পুরাণো বড় গ্রুপফটোতে তোমার ছবি দেখেছিলাম। সেই পুরাণো ফটোখানা মাসিমার কাছে চেয়ে নিয়ে তারি থেকে—।

তাই নাকি!

ভজহরি আর একটু কাছে সরিয়া বসিল।

৬

বেলা সধবা হইয়াছে। সংবাদপত্রে পাইলট সরখেলের বিধবা-বিবাহের সংবাদ বাহির হইয়াছে। মাসিমা খুসী হইয়াছেন।

ভজহরির একটা 'গতি' হইয়াছে দেখিয়া নরহরি আহ্লাদিত হইয়াছে। ভজহরি ও বেলা সেদিন নরহরিকে চুংওয়ায় নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইয়াছে।

বিচালি-ভবন

১

পাইলট ভজহরি সরখেল ভালই ছিল। যেখানে সেখানে আকাশে উড়িয়া বেড়ান, আর মাঝে মাঝে মাসীর বাড়ীতে আসিয়া বেলার সঙ্গে সাক্ষাৎ—ইহাই ছিল তাহার কাজ। আকাশে যেমন করিয়া এরোপ্লেন ওড়ে, তেমন করিয়াই তাহার জীবনের দিনগুলিও উড়িয়া যাইতেছিল।

কিন্তু বিধি বাম। ভজহরি ও বেলার এই দু'দিনের সুখ বিধাতার সহিল না। এক দিন 'বাংলা দেশের কোন একটি স্থানে' ইঞ্জিনের গোলমাল হওয়ায় বাধ্য হইয়া নামিয়া পড়িবার সময়ে এরোপ্লেনখানি একটা বটগাছের মধ্যে আটকাইয়া গেল। ভজহরি প্রাণে বাঁচিল বটে, কিন্তু তাহার ডান পাখানা ভাঙিয়া গেল। নিকটবর্তী গ্রামের লোকের সহায়তায় একটা সহরে কোন মতে পৌঁছিয়া তথা হইতে কলিকাতায় আসিয়া সে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়। ভাঙা পা কিছুদিন পরে জোড়া লাগিল, কিন্তু পাইলটগিরি চাকুরীর শেষ হইল। হাসপাতাল হইতে ফিরিয়া ভজহরি বেলাকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া এক মুঠা চিনা সিঁদুর তাহার সিঁথিতে ঘষিয়া দিয়া বলিল, তোমার পুণ্য বলেই এ যাত্রা বেঁচে গেলাম। বেলা সেই দিনই কালীঘাটে গিয়া মায়ের পূজা দিয়া আসিল।

২

ভজহরি তদীয় বন্ধু নরহরির মেসে গিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিল। নরহরি বলিল, খুব বেঁচে গেছিস্। তখনই বলেছিলাম—

বেঁচে তো গেলাম। কিন্তু বেঁচে থাকবার কোন উপায় তো দেখছি নে।

একটা বিড়িতে খুব জোরে টান দিয়া নরহরি বলিল, উপায় একটা ক'রে নিতেই হবে।

হবে, তা তো বুঝছি। এখন মাসীর বাড়ী ক'দিন থাকা যায়? আমি না হয়, দু'চার দিন মেসে তোর ফ্রেণ্ড হয়ে থাকতে পারি—পারি, মানে, আজ থেকেই তো থাকবো ভাবছি। কিন্তু ফ্রেণ্ডের বউ তো আর মেসে এসে থাকতে পারবে না। অথচ—

থাক না বউ মাসীর বাড়ী আর দিন কতক।

না ভাই, সে হয় না। যখন রোজগার ছিল তখনকার কথা আলাদা। সত্যি, ভাল এক ফ্যাচাং জুটিয়েছি।

ও ফ্যাচাং সবাই জোটায়। কিন্তু তোর বউ তো খুব লক্ষ্মী!

তা কি আমি অস্বীকার করছি। সে কথা থাক। এখন কি করা যায়, বল তো?

ভেবে দেখি। এখন যা, তোর বিছানাপত্র নিয়ে আয়। আমি মেসের ম্যানেজারকে ডেকে বলে দিচ্ছি।

নরহরি দশটা পাঁচটা আফিস করে। তদীয় ফ্রেণ্ড ভজহরি দশটা পাঁচটা টো টো করে। কিন্তু কোথাও কিছু হয় না। এক দিন বৈকালে উহারা উভয়েই মেসে ফিরিয়াছে। উভয়েরই পাশে এক কাপ করিয়া চা—হাতে শালপাতার ঠোঙায় কয়েকখানি করিয়া শিঙাড়া ও বেগুনি। একখানি শিঙাড়ায় কামড় দিয়া নরহরি বলিল, এক কাজ কর—

ভজহরি উৎসুক হইয়া বলিল, কি, তোমার অফিসে কোন কাজ খালি আছে নাকি?

না, অফিস টফিস না। দিন কতক দেশে গিয়ে থাক। শুনেছি, তোর তো কিছু জমিজমাও আছে। তাই দেখে শুনে যদি—

সাহস হয় না। জমিজমা যা আছে, সে তো নাম মাত্র। তাতে আমার, মানে, আমাদের কোন মতে দিনপাত হয়তো হতে পারে ; কিন্তু যা ভীষণ ম্যালেরিয়া, সেবার তো মরতেই বসেছিলাম। কলকাতায় পালিয়ে না এলে এত দিন কবে ভূত হয়ে যেতুম।

যা বলেছিস। পুকুরভরা মাছ আর গোলা ভরা ধান—ওটা যেন কবির কাব্যের মতই শোনায়। পিলে ভরা পেটটাই যেন শুধু বাস্তব হয়ে রয়েছে আমাদের গ্রামে গ্রামে।

তাছাড়া আর এক মুস্কিল আছে। জানিস তো, আমার বউটা বিধবা ছিল। বিয়ের পরদিনই ওর আগের স্বামীটা মারা যায়। গ্রামে গিয়ে ওকে নিয়ে কি বাস করা যাবে ?

তাও তো বটে।

শিঙাড়া ও বেগুনী শেষ হইয়া গিয়াছে। চায়ের কাপও প্রায় শেষ। নরহরি একটু চায়ের ভক্ত। চাকরকে ডাকিয়া আর দুই কাপ চা আনিতে বলিল।

আচ্ছা, এক কাজ কর। আমার এক দূর সম্পর্কের পিসী আছেন রহিমপুরে। ছেলেপুলে নেই। জমিজমা কিছু আছে, নিজেই দেখেন। তিনি কিছুদিন আগে আমাকে লিখেছিলেন, তার কাছে গিয়ে থাকতে, আর তাকে আগলাতে। বুড়ো হয়েছেন, এখন আর একা একা পেরে ওঠেন না। কিন্তু আমার আর ওসব ঝক্কি পোষায় না। আর কার জন্যেই বা সংসার ?

তুমি তাহলে আইবুড়োই থাকবে চিরকাল ?

এখনো তোর সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে নাকি ? যাক, যা বলছিলুম।

তুই বরঞ্চ যা পিসীমার ওখানে। ওখানে তো তোদের কেউ চেনে না। তুই জমিজমাগুলো দেখিস, আর তোর বউ পিসীমাকে যত্ন আত্তি করবে। তারপরে ক্রমশঃ—পিসিমা আর ক'দিন ?

তোমার পিসীমার মত হবে তো ?

হবে বলেই তো আমার বিশ্বাস। আজই লিখছি একখানা চিঠি।

দেখ লিখে কি উত্তর আসে। আমিও একটু ওর সঙ্গে পরামর্শ করি।

কাজের কথা তো হলো। এখন চল না একটা ছবি দেখে আসি। তোর বউকেও নিয়ে চল।

বেশ তো। তুমি তৈরী হয়ে নাও। আমি বেলাকে নিয়ে আসি। এই পথেই তো যাব।

৩

কলিকাতা হইতে এক শত মাইলের মধ্যে রেল লাইনের মাইল তিনেকের মধ্যে রহিমপুর গ্রাম। গ্রামখানির বিশেষত্ব কিছুই নাই। বাংলার পল্লী যা হয়, তাই। জীর্ণ কুটীর, শীর্ণ খাল, শ্যাওলাঢাকা ডোবা, অন্ধকার বাঁশ বন, আর ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়া।

ভজহরি ও বেলা পিসীমার বাড়ী আসিয়া পৌছিয়াছে। দুই পোতায় দুইখানি খড়ের ঘর। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এক পার্শ্বে একখানি রান্না ঘর, আর এক পাশে একখানি এমনি ঘর, তার বেড়া নাই। তাহাতে জ্বালানি কাঠ, ভাঙা তক্তপোষ, ছেঁড়া চাটাই, প্রভৃতি নানাবিধ আবশ্যক এবং আপাততঃ অনাবশ্যক দ্রব্যাদি রহিয়াছে।

একখানি ঘরে পিসীমা থাকেন, অন্য ঘরখানি ভজহরি ও বেলা অধিকার করিয়াছে। পাড়ার লোকেরা ইতিমধ্যেই আসিয়া তত্ত্বতল্লাস

লইয়া গিয়াছে। বেলাও সকলের সঙ্গে বেশ আত্মীয়তা পাতাইয়া বসিয়াছে। কয়েক দিনের মধ্যেই তাহার অনেকগুলি দিদি, মাসী, পিসী, কাকী, প্রভৃতি সংগৃহীত হইয়াছে।

পিসীমার আর কিছুই করিতে হয় না। রান্না বান্না, ঘর ঝাঁট দেওয়া, কাপড় কাচা, প্রভৃতি সবই বেলা করে। পিসীমা বারণ করিলেও শোনে না। এ দিকে বাহিরের সব কাজই করে ভজহরি। বাজারে যাওয়া, ঘর মেরামত করা, বাড়ীর সংলগ্ন জমিতে তরীতরকারি করা, দুই এক ঘর প্রজার কাছে খাজনা আদায় করা—সব ভারই লইয়াছে ভজহরি। পিসীমাও প্রায় গলিয়া গিয়াছেন। নিঃসন্তান বিধবা বহুকাল আত্মীয়-স্বজনহীন অবস্থায় বাস করিয়া নতন আত্মীয়তা ও আদর যত্ন পাইয়া যেন বাঁচিয়া গিয়াছেন। নিজর পুত্র ও পুত্রবধূর অভাব বুঝি এত দিনে পূরণ করিয়া লইবার সুযোগ পাইলেন।

পাড়ার লোক কেহ বলে, বুড়ী এত দিনে বেঁচে গেল। এ বয়সে একটু দেখবার শোনবার লোক না হলে কি জীবন বাঁচে!

কেহ বলে, ও'দুটো হতভাগার বরাত ভাল বলতে হবে। কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসল।

আর কেহ কেহ বলে, কাজটা বুড়ী ভাল করল না। কার মনে কি আছে কে জানে। এই যে স্থচ হয়ে ঢুকল, দেখো শেষে ফাল হয়ে বেরুবে।

পিসীমা, বেলা ও ভজহরি, কেহই এ সব কথায় কান দেন না। তাঁহাদের সংসারটি বেশ পাল-তোলা নৌকার মত হেলিয়া দুলিয়া নাচিয়া আগাইয়া যাইতে লাগিল। বেলা পাড়ায় খুব ভাব পাতাইয়াছে। বেশ আনন্দেই দিন কাটে। ভজহরি মাঝে মাঝে এক এক দিন কলিকাতায় ঘুরিয়া আসে। নরহরির সঙ্গে দেখা করিয়া দুটো সুখ দুঃখের

কথা বলিয়া, হয়তো বা এক সঙ্গে একটা সিনেমার ছবি দেখিয়া গ্রাম্য জীবনে একটু বৈচিত্র্য সংগ্রহ করিয়া আনে।

৪

ভজহরি ঘরের দাওয়ায় বসিয়া এক বাটি মুড়ি ও একখানি পাটালির সদ্ব্যবহার করিতেছে, এমন সময়ে ঐ গ্রামের একটি চাষী আসিয়া খবর দিল, বিচালির দাম নাকি হু হু করিয়া উঠিতেছে। যে বিচালি খড় টাকায় একশত আঁটি করিয়া বিক্রয় হইত, তাহাই নাকি টাকায় চার আঁটি করিয়া বিক্রয় হইতেছে। রহিমপুর ষ্টেশনে মহাজনের লোক বসিয়া আছে, আর গাড়ী বোঝাই খড় বিভিন্ন গ্রাম হইতে আসিয়া সেখানে মজুদ হইতেছে। রেলওয়ে সাইডিংএ অসংখ্য ওয়াগন আর ট্রাক খড়ের পাহাড় মাথায় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

ভজহরি জিজ্ঞাসা করিল, এত খড় কোথায় যাচ্ছে?

চাষী বলিল, কে জানে! সব নাকি যুদ্ধে যাচ্ছে।

যুদ্ধে খড় কি হবে?

কে জানে! খড় দিয়ে নাকি সেপাইদের তোষক বালিশ তৈরি হচ্ছে।

ভজহরির মাথায় কল্পনার অভাব ছিল না। সে ঐ খড়ের পাহাড়ের মধ্যে স্বর্ণ সুযোগের আভাস পাইয়া সেই দিনই কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। পিসীমার নিজেরই কয়েক বিঘা খড়ের জমি ছিল। তাছাড়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া আশে পাশের অনেকগুলি খড়ের জমির সহিত বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিল। তারপর কয়েক জন লোক এবং কয়েকখানি গরুর গাড়ী সংগ্রহ করিয়া, সেই সকল জমি হইতে সংগৃহীত খড়ের আঁটি রহিমপুর ষ্টেশনে চালান দিতে লাগিল।

খড়ের জমির মালিকের দাবী, খড় কাটার খরচ, আঁটি বাঁধিয়া লোকজন দিয়া গরুর গাড়ীতে বোঝাই, তারপর গরুর গাড়ীর ভাড়া, প্রভৃতি সর্বসমেত ভজহরির খরচ পড়িল একশ আঁটিতে তিন টাকা। কিন্তু ষ্টেশনে বিক্রয় হইল একশ আঁটি কুড়ি টাকা। ভজহরিকে আর পায় কে ?

নিকটবর্তী গ্রামের এবং অঞ্চলের সমস্ত খড় যখন কমিয়া বা ফুরাইয়া আসিবার মত হইল, তখন ভজহরির গরুর গাড়ীগুলিও এক প্রকার ম্যাজিক খেলা আরম্ভ করিল। একখানি গাড়ী ষ্টেশনের মালবাবুর সামনে আসে, চালান সহি হয়, সঙ্গে সঙ্গে একখানি ছবি আঁকা খসখসে কাগজ মালবাবুর পকেটে গিয়া পড়ে, গরুর গাড়ী খড়সমেত আস্তে আস্তে আগাইয়া চলিয়া যায়, আবার আম বাগানের ওপাশ দিয়া খালের ধার বাহিয়া, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তার উপর দিয়া খানিকটা ঘুরিয়া, আবার ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়ায়। আবার মালবাবু, আবার চালান, আবার ছবি আঁকা খসখসে কাগজ, আবার খড়ের গাদা লইয়া গরুর গাড়ীর অগ্রগমন। এমনই করিয়া ভজহরির একগাড়ী খড় অন্তত পনের গাড়ীতে পরিণত হয়। চালান কলিকাতায় যায়। খড়ের কণ্ট্রাক্টর কোম্পানীর কাছ হইতে তাড়া তাড়া ছবি আঁকা খসখসে কাগজ ভজহরির পকেটে আসিয়া উপস্থিত হয়।

পিসীমার একটি কাঠের সিন্দুক আছে, তাহাতেই সে টাকা আনিয়া রাখে। পিসীমা ও বেলা ছাড়া ভজহরি আর কাহাকেও কিছু বলে না। অত টাকার রাশি দেখিয়া পিসীমার ভয় হয়। সারারাত তিনি কাঠের সিন্দুকের উপর মশারি টাঙাইয়া শুইয়া থাকেন।

ইতিমধ্যে ভজহরি কলিকাতায় গিয়া একটি ব্যাঙ্কে একাউণ্ট খুলিয়া আসিয়াছে। মধ্যে মধ্যে পিসীমার সিন্দুক হইতে টাকা লইয়া গিয়া সেখানে রাখিয়া আসে।

যথেষ্ট সাবধানতা সত্ত্বেও উহাদের আর্থিক উন্নতি পাড়ার লোকের কাছে একেবারে চাপা থাকে না। উহারা একটু ভাল খান, ভাল পরেন, ঘন ঘন কলিকাতায় যান, ইহাকে উহাকে যখন তখন এটা দেন ওটা দেন, ইত্যাদি নানাপ্রকার লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে। স্বাস্থ্য ভাল হইলে তাহার লক্ষণ তো প্রকাশ পাইবেই। ইঁহারাও আদর আপ্যায়ন ও মিষ্ট ব্যবহার দিয়া প্রতিবেশীকে আপন করিয়া লইতে চেষ্টা করেন।

৫

রহিমপুর ও নিকটবর্তী অঞ্চলের খড় ফুরাইয়া আসিয়াছে। খড়ের কণ্ট্রাক্টার কোম্পানী এদিককার ব্যবসায় তুলিয়া দিবার সঙ্কল্প করিয়া হিসাব নিকাশ আরম্ভ করিয়াছেন। ভজহরি সংবাদ পাইল, মালবাবু নাকি কোথায় সরিয়া পড়িয়াছেন। তাহার গরুর গাড়ীর পৌনঃপুনিক ব্যাপার লইয়া কোন গোলযোগ হইবে না তো?

এদিকে বেলাদের অবস্থা ভাল হওয়ায় প্রতিবেশীদের অনিদ্রা ও অগ্নিমান্দ্য রোগে ধরিয়াছে। উহাদের সকলেরই সর্বদা বেলাদের সম্বন্ধেই চিন্তা, তাহাদের সম্বন্ধেই ঔৎসুক্য, তাহাদের সম্বন্ধেই আলোচনা, তাহাদের সম্বন্ধেই অনুমান ও নানাপ্রকার গবেষণা লইয়াই দিন কাটে। কিছু দিন পরেই ভজহরিদের সম্বন্ধে নানাবিধ গল্প ও ইতিহাসে পাড়ার মেয়ে-পুরুষ সকলেই যেন মাতিয়া উঠিল। ক্রমশঃ নাকি বেলার বিগত বৈধব্যের কথাটাও ধীরে ধীরে পিসীমার কর্ণগোচর হইল।

ব্যবসায়ে ও পরিবারে, বাহিরে ও ঘরে, পরিস্থিতিটা যখন ঘোরালো হইয়া উঠিল, তখন ভজহরি এক দিন কলিকাতায় গিয়া নরহরির সহিত পরামর্শ করিল। নরহরি বলিল, এবার রহিমপুর ছাড়।

কয়েক দিন পরে এক দিন রাত্রিতে পিসীমাকে সিন্দুকের উপর

মশারীর মধ্যে শোয়াইয়া রাখিয়া, ভজহরি ও বেলা তাহাদের পুরাতন স্থটকেশটি হাতে করিয়া কলিকাতা যাত্রা করিল। ভজহরি গেল নরহরির মেসে। বেলা গেল মাসীর বাড়ী, বিবেকানন্দ রোডে।

খড় কণ্ট্রাক্টর কোম্পানী খড়ের ব্যবসায় তুলিয়া দিয়া, কাঠ ও তামাকের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন। রহিমপুরের খড়ের ব্যাপার ক্রমশঃ রহিমপুরের লোকে ভুলিয়া গেল। ক্রমশঃ খড় কোম্পানীও খড়ের কথা ভুলিয়া গেল। কিন্তু ভজহরি ও বেলা তাহা ভুলিতে পারিল না।

কিছু দিন পরে বিবেকানন্দ রোডের ধারে একটি ছোট জমির উপর একখানি অতি স্থদৃশ্য অট্টালিকা গড়িয়া উঠিল। গেটের পাশে পাথরের ফলকে নাম লেখা 'বিচালি-ভবন'।

বাড়ী সাজাইয়া ভজহরি ও বেলা নূতন বাড়ীতে উঠিয়া আসিয়াছে; নরহরিকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইয়াছে। মাসীমা আসিয়া দেখিয়া শুনিয়া সব গোছ গাছ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারই দূর সম্পর্কীয়া তাঁহারই বাড়ীর প্রায়-ঝি বেলারাণী আজ সত্যই রাজরাণী হইয়াছে দেখিয়া তাঁহার আনন্দের সীমা নাই।

বেলা ঘরে রাণীগিরি করিতেছে এবং ভজহরি বাইরে গৌরী সেন এণ্ড কোম্পানীতে নিত্য নূতন কণ্ট্রাক্ট সংগ্রহ করিতেছে। এখন কে বলিবে, ভজহরি বেকার?

কুটির-শিল্প

১

বিবেকানন্দ রোডে 'বিচালি-ভবনে' ভজহরি সরখেল বাস করেন। মস্ত কণ্ট্রাক্টর। সমস্ত দিন মোটরে চড়িয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। সন্ধ্যার পর একটু আড্ডা, তার পরেই ঘুম।

বেলার হইয়াছে মুস্কিল। বাড়ীতে দু'টি মাত্র প্রাণী, তার একজন থাকেন সর্বদা বাহিরে। ঝি, চাকর, পাচক আর দরওয়ানের উপর হুকুম করিয়া, এ-ঘর ও-ঘর ঘুরিয়া, ছাদে-বারান্দায় দাঁড়াইয়া, নভেল পড়িয়া, আর শুধু শুধু একতলা দোতলা করিয়া সময় তো আর কাটে না। এক মাসীবাড়ী ছাড়া অন্য কোথায়ও যাতায়াত নাই। এক দিন বেলা ভজহরিকে বলিল, দেখ, এমন নিষ্কর্মা জীবন তো ভাল লাগে না। সারা দিন কি করি বল তো?

ভজহরি বলিল, লেখাপড়া করবে? যদি বল তো জন দুই মাষ্টার রেখে দি। একজন সকালে পড়াবে, আর একজন বিকালে।

বেশ তো তাই কর, আমি পড়া-শুনা করব।

মাষ্টার আসিল। পড়াশুনা চলিতে লাগিল। কিন্তু বেশি দিন বেলার ভাল লাগিল না। বাংলা সে ভালই জানিত। মাষ্টার মহাশয়দের নিকট হইতে ইংরেজিও বেশ শিখিল। কিন্তু পাঁচ সাতটা বিভিন্ন বিষয় পড়িয়া পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়া, এটা তার একেবারেই পছন্দ হইল না। সে পড়িতেছে স্বেচ্ছায়। যাহা ভাল লাগিবে, তাহা পড়িবে, যাহা

ভাল লাগিবে না, তাহা পড়িবে না। কিন্তু যাহা ভাল লাগে না, তাহা ভাল করিয়া না পড়িলে বিশ্ববিদ্যালয় শুনিবে না। সুতরাং বেলার পড়াশুনার 'ইতি' হইল। মাষ্টারেরা চলিয়া গেলেন। বেলার বর্ধিত বিদ্যার ফলে ঘরে তিনটি নূতন আলমারী আসিল। ইংরাজি ও বাংলা ভাল ভাল বইতে আলমারীগুলি ভরিয়া গেল।

কিন্তু তবু বেলার সময় কাটে না।

ভজহরি গেল বন্ধু নরহরির মেসে। নরহরি সব শুনিয়া বলিল, এ তো ভাল কথা নয়।

এখন কি করি বল তো? ওকে বিয়ে করে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক তো প্রায় শেষ হয়েছে। একটা ছেলেপুলেও হ'ল না এখনো!

আচ্ছা, এক কাজ কর। একটা 'কুটির-শিল্প' আরম্ভ কর। লাগিয়ে দে তোর বৌকে। সময়ও কাটবে, দু'পয়সা ঘরেও আসবে।

কি শিল্প করবে? চরকা? তাঁত? আমসত্ত্ব? আচার? ফ্রক, ব্লাউজ? কি আরম্ভ করা যায়, বল তো?

ওসব করতে পার। কিন্তু ওর চেয়ে ভাল শিল্প হচ্ছে মাদুলী-শিল্প।

মাদুলী-শিল্প?

হ্যাঁ। যদি একবার ভাল করে পত্তন করতে পার, তাহ'লে ভবিষ্যতের ভাবনা থাকবে না। তোমার কণ্ট্রাক্ট ফণ্ট্রাক্ট—যত বড়ই হোক, ওর উত্থান-পতন আছে। কিন্তু—

আচ্ছা, তাই করা যাক।

কিরূপে কাজ আরম্ভ করা যায় তৎসম্বন্ধে পরামর্শ করিয়া, চা খাইয়া, নরহরিকে রাত্রে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়া, ভজহরি বাড়ী ফিরিল এবং সব কথা বেলাকে খুলিয়া বলিল।

২

একদিন সকালে খবরের কাগজে সংবাদ বাহির হইল, তালতলার ভূপতি চ্যাটার্জির সঙ্গে ভবানীপুরের শ্রীপতি ব্যানার্জির মোকদ্দমা হইতেছে। বাদী ভূপতি, প্রতিবাদী শ্রীপতি, দাবী আড়াই লক্ষ টাকা। সংবাদ পড়িয়া বেলা ভজহরিকে বলিল, এদের ঠিকানা দু'টো আনিয়ে দাও না।

ভজহরি কোর্টে গেল। যেখানে কোর্ট সেখানেই বটগাছ। একটি বটগাছের তলায় একটি পাকা মুহুরিকে ধরিয়া, সে কাহাকেও কিছু বলিবে না, এইটুকু প্রতিশ্রুতি লইয়া, তাহাকে বলিল, এই ভূপতি ও শ্রীপতির ঠিকানা দু'টো চাই।

মুহুরি বলিল, এ আর এমন কি কাজ। এখুনি এনে দিচ্ছি!

ভজহরি জিজ্ঞাসা করিল, আপনি চেনেন না কি ওদের?

ওদের? আপনি হাসালেন। আমি প্রত্যহ চীন দেশ থেকে আরম্ভ করে পেরু পর্যন্ত যে কোন দেশের যে কোন লোককে আইডেণ্টিফাই করি, আর এই ভূপতি আর শ্রীপতিকে চিনবো না?

মুহুরি ঠিকানা দুইটি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া ভজহরিকে দিল।

ভজহরি ঠিকানা দুইটি আনিয়া বেলাকে দিল।

পরদিন সকালে দুইটি মুমূর্ষু-অশ্ব-বাহিত একখানি থার্ডক্লাসের ভাড়াটিয়া গাড়ী আসিয়া থামিল তালতলার ভূপতি বাবুর দরজায়। ভূপতি বাবু উকিল। কয়েকজন পাকা উকিলের সহায়তায় নিজেই নিজের মোকদ্দমা পরিচালনা করিতেছেন। অনেকগুলি লোক চারি পাশে বসিয়া আছে। তাঁহারা সবিস্ময়ে দেখিলেন, ঘোড়ার গাড়ী হইতে নামিয়া আসিলেন একটি রূপসী বিবাহিতা নারী। ঘরে ঢুকিয়া সকলের সামনে আসিয়া বিগলিত স্বরে বলিলেন, হ্যাঁ বাবা, ভূপতি বাবু বুঝি তোমার নাম?

উকিল বাবুর বৈঠকখানায় উকিল বাবুকে চিনিতে পারা মোটেই কঠিন নয়। কিন্তু অপরিচিতা সুন্দরীর মুখে অকস্মাৎ নিজ নাম শুনিয়া ভূপতি বাবু খুবই বিস্মিত হইলেন। পার্শ্বচরেরাও কম বিস্মিত হইলেন না। সুন্দরী বলিলেন, বাবা, তুমি বড় ঝঞ্ঝাটে পড়েছ। থাকতে পারলুম না। এই নাও, এই মাতুলীটা পর। সব ঠিক হয়ে যাবে! সময়মত আমি আবার আসবো। বৃথা আমার খোঁজ করো না।

এই কথাগুলি বলিয়াই সুন্দরী বাহির হইয়া আসিয়া অশ্বিসার ঘোটকবাহিত গাড়ীতে চড়িয়া অন্তর্হিত হইলেন। বৈঠকখানার লোকেরা অবাক্ হইয়া গেল। এ কি হইল! স্বপ্ন, না মায়া, না মতিভ্রম! ভূপতি বাবু মাতুলীটি মাথায় ঠেকাইয়া বাম বাহুতে পরিয়া ফেলিলেন। এক জন বলিলেন, এ দৈবশক্তির আবির্ভাব। এ মোকদ্দমায় তোমার আর হার নেই। অপর এক জন বলিলেন, কিছুই কিন্তু বোঝা গেল না। প্রথম বক্তা বলিলেন, কতটুকু আমরা বুঝি? দেয়ার আর মোর থিংস্ ইন হেভেন্ অ্যাণ্ড আর্থ দ্যান আর ড্রেম্পট্ অফ ইন ইওর ফিলজফি। এ নিশ্চয়ই দৈব আবির্ভাব! ভূপতি বাবুর চেয়ারের পিছনে কাচের আলমারির মধ্যে মোরক্কো চামড়ায় মুখ ঢাকিয়া মিল এবং বেন্থাম পরস্পরের দিকে অপাঙ্গে চাহিলেন।

কিছুক্ষণ পরে সুন্দরীকে দেখা গেল ভবানীপুরে শ্রীপতি বাবুর বাড়ীতে। পূর্ববৎ মাতুলী বিতরণের পর সেখান হইতে ঘোড়া-গাড়ীতে রসা রোড পর্যন্ত গিয়া পূর্বনির্দিষ্ট স্থানে মোটরে উঠিয়া সুন্দরী ফিরিলেন বিবেকানন্দ রোডে। টপাটপ সিঁড়ি বাহিয়া বেলা উঠিল দোতলায়। ভজহরি জিজ্ঞাসা করিল, মাতুলী দিয়ে আসতে পেরেছ?

হ্যাঁ, দু'জনকেই দিয়েছি। এক জন তো মোকর্দ্দমায় জিতবেই।

৩

সে দিন দুপুরবেলা। মির্জাপুর ষ্ট্রীট এবং রাধানাথ মল্লিক লেনের কাছে মোটর রাখিয়া বেলা আসিয়া দাঁড়াইল গোলদীঘির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে, গামছার রাশির পাশে। সে দিন ইউনিভারসিটির একটা পরীক্ষা ছিল। ছেলেরা সব ডাব, কমলালেবু, আখ, শশা, চীনাবাদাম, ইত্যাদি খাইতেছে এবং কলরব করিতেছে। একটি ছেলের কাছে গিয়া আস্তে তাহার কাঁধে হাত দিয়া বেলা বলিল, তুমি বুঝি পরীক্ষে দিচ্ছ?

ছেলেটি একটু অবাক্ হইয়া দেখিল, মহিলাটি ঠিক তার সেজ মাসিমার মত। পরীক্ষার চাপে মনটা খুবই নরম হইয়াছিল, মহিলার কথা শুনিয়া একেবারে গলিয়া গেল! বলিল, হ্যাঁ। এবেলার পরীক্ষাটা বড় খারাপ হয়ে গেছে। ওবেলায় ভাল না হলে ফেল করব।

বালাই, ষাট! ফেল করতে যাবে কেন? কত কষ্ট করে বাছারা সারা বছর পড়াশুনা করেছ। এই নাও। এই মাদুলীটা পরে ফেল।

এদিক ওদিক চাহিয়া ছেলেটি বাঁ-হাতের সার্টের আস্তিন গুটাইয়া মাদুলীটি পরিয়াই তাড়াতাড়ি ঢাকিয়া দিল। দাম-জিজ্ঞাসু হইয়া মহিলাটির দিকে তাকাইতেই তিনি বলিলেন, ছিঃ বাবা, ও কথা ভাবতে নেই। দাম কিসের? বরং তোমার ঠিকানাটা দাও। পরীক্ষার ফল বেরুলে দেখব পাশ করেছ কি না। পাশ তো তুমি করেই আছ। হ্যাঁ, কিছু ভেবো না।

ছেলেটি তার নাম, স্কুল, রোল নম্বর, বাড়ীর ঠিকানা সব লিখিয়া মহিলাটির হাতে দিল।

প্রায় এমনি করিয়াই বেলা প্রায় পঞ্চাশটি মাদুলী বিতরণ করিয়া এবং পঞ্চাশটি ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া বাড়ী ফিরিল।

বৈকালে ভজহরিকে বলিল, একটু ঘুরে আসছি মাসী-বাড়ী থেকে!

মাসী-বাড়ী গিয়াই মাসীমাকে বলিল, দেখি হাতখানা, একটা মাতুলী পরিয়ে দি।

কেন? আমি মাতুলী পরব কেন?

দেখই না, তোমার সেই ফিক্-ব্যথাটা সারে কি না।

মাতুলীতে আবার অসুখ সারে!

সারুক আর নাই সারুক, পরই না।

মাসীমা মাতুলী পরিলেন। মাসীমার দেওরের স্ত্রীর সন্তান হইতে অকারণ বিলম্ব হইতেছিল, মাসীমার ভাসুরঝির হিষ্টিরিয়া কিছুতেই সারিতেছিল না, মাসীমার ভাসুরপো পর পর তেইশখানা দরখাস্ত পাঠাইয়াও চাকুরী সংগ্রহ করিতে পারে নাই এবং এইরূপ অন্যান্য অনেক আত্মীয়-কুটুম্ব নানারূপ দৈহিক, ঐহিক ও মানসিক ব্যাধিতে ভুগিতেছিলেন। ইহারা সকলেই একটি করিয়া মাতুলী পরিলেন। বিনামূল্যে সর্বরোগহর ঔষধ পাইলে কে না ব্যবহার করে?

উপরোক্ত প্রকারে এবং অন্য নানাবিধ উপায়ে কিছু দিনের মধ্যেই প্রায় পাঁচ শত বিভিন্ন শ্রেণীর নরনারীর বাহুতে, মণিবন্ধে, কটিদেশে ও গলদেশে বেলা দেবী-বিতরিত পরম-হিতকর দৈব কবচ শোভা পাইতে লাগিল।

৪

কয়েক মাস কাটিয়া গিয়াছে। ছেলেদের পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। ভূপতি-শ্রীপতি মোকদ্দমার রায় বাহির হইয়াছে। অন্যান্য যাহারা মাতুলী পরিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ফল পাইয়াছেন। সে ফল মাতুলীর জন্যই হউক, বা অন্য ঔষধের জন্যই হউক, বা আপনা-আপনি প্রকৃতির নির্দেশেই হউক, মোট কথা ফল কোন কোন ক্ষেত্রে

ফলিয়াছে। যেমন, মাসীমার দেওরের স্ত্রী সন্তানসম্ভবা হইয়াছেন, মাসীমার ভাসুরঝির হিষ্টিরিয়া সারে নাই, ভাসুরপো চাকরি পাইয়াছে, ইত্যাদি।

সংবাদপত্র মারফত শ্রীপতি বাবুর জয়লাভের সংবাদ পাইয়া বেলা আবার চলিল ভবানীপুর। শ্রীপতি বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহার ভক্তিগদ্‌গদ প্রণতি ও সাড়ম্বর প্রশংসাপত্র সংগ্রহ করিয়া এবং অতি বিনীত ভাবে কোনরূপ পারিতোষিক গ্রহণে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়া স্বকীয় দেবীত্বের মর্যাদাসহ গৃহে ফিরিল।

ছেলেদের পরীক্ষার ফল যখন সংবাদপত্রে বাহির হইল, তখন নাম দেখিয়া এবং পূর্ব-আহরিত ঠিকানা মিলাইয়া পাশ করা ছেলেদের বাড়ীতে গিয়া প্রচুর জলযোগসহ প্রশংসাপত্র সংগ্রহ করিতে বেলার বিলম্ব হইল না। যাহারা পাশ করিয়াছিল, তাহারা মনে করিল, মাদুলীর গুণেই তাহারা পাশ করিয়াছে। যাহারা ফেল করিল, তাহারা মনে করিল, অদৃষ্টের দোষেই ফেল করিল।

এমনি করিয়া নানা স্থান হইতে নানাবিধ নরনারীর নিকট নানাবিধ প্রশংসাপত্র সংগৃহীত হইল।

এক দিন প্রাতে প্রত্যেকখানি দৈনিক সংবাদপত্রের পাঠকবর্গ সবিস্ময়ে দেখিলেন, এই কাগজ-দুষ্প্রাপ্যতার দিনেও এক পূর্ণপৃষ্ঠাব্যাপী বিজ্ঞাপন। পৃষ্ঠার মধ্যস্থলে শ্রীযুক্তা বেলা-দেবী কবচ-বাচস্পতি-বিতরিত "পরমব্রহ্ম কবচের" মহিমা প্রচারিত হইয়াছে। পৃষ্ঠার চারি দিকে সমাজের প্রত্যেক স্তরের নরনারীর এক একখানি প্রশংসাপত্র। কবচের মূল্য নাই। কিঞ্চিৎ দক্ষিণামাত্র আছে—সাধারণ, তাড়াতাড়ি ফলদায়ক এবং অতি তাড়াতাড়ি ফলদায়ক—এই তিন প্রকার শ্রেণী-বিভাগ হইয়াছে।

বিজ্ঞাপন বাহির হইবার পর হইতে বেলার আর আহার-নিদ্রার

সময় রহিল না। কেবল অর্ডার আর অর্ডার। বাড়ীর নীচের তলাটা ভরিয়া গেল শুকনো গাঁদা ফুল আর শুকনো তুলসীর পাতায়। হাজারে হাজারে তামা, রূপা ও সোনার মাতুলী আসিতে লাগিল। কয়েক জন লোক রাখা হইল, তত্ত্বাবধানের জন্য। বেলার কুটির-শিল্প সার্থক হইল।

ভজহরি নরহরিকে গিয়া বলিল, তোমার কুটির-শিল্প তো বেশ জেঁকে উঠেছে। এক দিন গিয়ে দেখে এস।

দেখবো আর কি? বিজ্ঞাপনের বহর দেখেই বুঝতে পারছি।

আচ্ছা, লোকগুলো এই সব প্রশংসাপত্র দেখে ভোলে কি করে? একশ' জনের মধ্যে এক জন হয়ত উপকার পেয়েছে—অন্য কোন কারণে। বাকী নিরানব্বই জন যে কোন উপকারই পেল না, এ কথাটা লোকে ভেবে দেখে না।

এই ফ্যালাসি-অব-ম্যাল-অবজারভেশন বড় ভয়ানক ফ্যালাসি। যখন লজিকে এটা পড়েছিলাম তখন কল্পনাও করিনি যে এর এত বড় প্রতাপ।

সবাই তো আর লজিক-পড়া বিদ্বান্ নয়!

এ ব্যাপারে বিদ্বান্-মূর্খের প্রভেদ নেই। বরঞ্চ দেখবে, অনেক বড় বড় ডিগ্রীর আড়ালে বড় বড় মাতুলীর সমারোহ!

ভজহরি সন্ধ্যার পরে বেলাকে বলিল, তুমি কি সারাদিন তোমার মাতুলী নিয়েই থাকবে। আমার সঙ্গে একটু কথা বলবার সময়ও নেই তোমার?

যাঁক্, এবার তবু বুঝেছ, এত দিন আমার কেমন লাগত।

যাই বল, বাড়ীর উপর এত বড় ফ্যাক্টরি চলবে না। ভাবছি, একটা লিমিটেড কোম্পানির হাতে এটা দিয়ে দি। ফ্যাক্টরির নাম দেব, 'দি বেলা দেবী অ্যামুলেট ফ্যাক্টরি লিমিটেড।'

গণক

বিবেকানন্দ রোডে "বিচালি-ভবনে" বাস করেন ভজহরি সরখেল এবং তদীয় সহধর্মিণী বেলা দেবী। কণ্ট্রাক্টর ভজহরির দিন বেশ ভালই যাইতেছে। কণ্ট্রাক্টের লাভের পরিমাণ কিঞ্চিৎ কমের দিকে যাইতেছে বটে, তথাপি তাহার সেজন্য উদ্বিগ্ন হইবার কোন কারণ ঘটে নাই। এদিকে বেলা দেবী প্রতিষ্ঠিত মাদুলীর কারখানাটিও বেশ চলিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিদ্যাই মাদুলী প্রচারে সহায়তা ব্যতীত বাধা প্রদান করিতেছে না।

কিন্তু তবু সরখেল দম্পতীর মনে সুখ নাই। তাহাদের কেবলই মনে হয়, কে ভোগ করিবে এই সব বাড়ীঘর, কারখানা, কণ্ট্রাক্টারির লাভ! দুইটি দেবাদেবীর আর কতটুকুই বা অভাব, কতই বা তাহারা খরচ-খরচা করিবে? সংসারে লোকে স্বোপার্জিত বা উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জিত সবই শেষ পর্যন্ত দিয়া যায় সন্তান-সন্ততির হাতে। কিন্তু সেই সাধে বাদ সাধিয়াছেন ভগবান। এখনও বেলা দেবীর সন্তান হইল না। আধ্যাত্মিকতাবর্জিত পাশ্চাত্ত্য দেশে অবশ্য এজন্য কেহ এমন একটা হা-হুতাশ বড় একটা করে না। নিঃসন্তান পিতামাতা তাঁহাদের সমস্ত অর্থ প্রায়ই কোন হাসপাতালে, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে বা অন্য কোন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে ফেলিয়া দিয়াই তাঁহাদের ঐহিক কর্তব্য শেষ হইল মনে করেন। কিন্তু আমাদের এ অধ্যাত্মভূমিতে তো আর সেটা সম্ভব নয়—অন্তত সাধারণের পক্ষে তো নয়ই। সুতরাং সন্তানকামনা ব্যতীত সরখেল দম্পতীর আর কি কামনা থাকিতে পারে?

বেলা দেবী শান্তি-স্বস্ত্যয়নের কথা তুলিলেই ভজহরি তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দেয়। বেলা বলে, কি করে আমাদের অবস্থা এমন হ'ল, তা তো তুমিও জান, আমিও জানি। হয়তো সেই পাপেই—

পাপ! হাসালে বেলা, হাসালে! বিজনেস্ জিনিষটাই তুমি বুঝলে না।

আমার আর বেশি বুঝে কাজ নেই।

বেলা মুখ ভার করিয়া রহিল। ভজহরি আস্তে আস্তে উঠিয়া বন্ধু নরহরির মেসে গিয়া উপস্থিত হইল। সব শুনিয়া বিড়িতে একটা লম্বা টান দিয়া নরহরি বলিল, তা একটু ধর্ম-টর্ম করে দেখতে পার। ক্ষতি তো নেই—

তাই বলে, যা কখনো বিশ্বাস করিনে, যার কোন মানে নেই—তাই করবো?

আরে বাপু, কতরকম বিজনেসই তো করলে! মনে কর এও একটা বিজনেস। লাভ না হলেও লোকসান তো নেই।

২

কালীঘাট মন্দিরের নিকটে একখানি মোটর আসিয়া দাঁড়াইল। ড্রাইভার দরজা খুলিয়া দিতেই গাড়ী হইতে নামিল ভজহরি ও বেলা। ড্রাইভারের পাশের আসন হইতে নামিল একটি চাকর, তাহার হাতে ফুলের মালা, ফল ও মিষ্টান্ন ভরা চুপড়ি। মন্দিরে গিয়া প্রণাম করিয়া, মালা ইত্যাদি উপঢৌকন দিয়া, ফল ও মিষ্টান্নের নৈবেদ্য নিবেদন করিয়া, চরণামৃত লইয়া, ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিয়া, কপালে চন্দনের ফোঁটা পরিয়া বেলা ও ভজহরি যখন পুনরায় গাড়ীতে উঠিতে যাইবে তখন হঠাৎ তাহাদের দৃষ্টি পড়িল পথের পাশে একটি গণকঠাকুরের প্রতি। মনে

হইল গণকঠাকুরটি যেন এক দৃষ্টিতে তাহাদের দিকে চাহিয়া আছে। বেলা বলিল, চল না, ঠাকুরকে একটু হাতখানা দেখিয়ে যাই।

যাও, শুধু শুধু ওসব করে কি লাভ ?

কেন, হাত দেখে ওঁরা তো অনেক ভবিষ্যতের কথা বলে দিতে পারেন।

পারেন, কি পারেন না, তা জানিনে। তবে ওঁদের কথা শুনে কোন লাভ আছে কি ? যদি হাত দেখে বলেন, তিন বছর পরে তোমার একটা কঠিন অসুখ হবে, তাহলে, অসুখ হোক আর নাই হোক, এখন থেকে ভাবনা আর উদ্বেগ সুরু হবে তো !

তুমি যাই বল, আমি একবার হাতটা দেখাব। দেখিই না, কি বলেন উনি। লোকটিকে দেখে আমার খুব ভক্তি হচ্ছে।

বেশ, তবে চল।

বেলা ও ভজহরি গণকঠাকুরের কাছে উপস্থিত হইল। গণকঠাকুরের মাথায় টিকি, তাহাতে একটি ফুল ঝুলিতেছে। কপালে চন্দনের ত্রিশূল। দুই বাহুতে চন্দনের ছাপ। গায়ে নামাবলী। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। একখানি বড় কুশাসনের উপর বসিয়া আছেন। বাঁ পাশে একটি নস্যের ডিব্বা। সামনে একখানি শতরঞ্চি পাতা, তার উপরে মোটা কাগজে নানা প্রকার ছক ও রেখা আঁকা আছে। কাগজখানির ঠিক মধ্যস্থলে একটি সাদা পদ্মফুল।

বেলা ও ভজহরি উভয়ে নিকটে গিয়া হাত তুলিয়া ছোট একটু নমস্কার করিয়া শতরঞ্চির পাশে গিয়া বসিল।

বেলার দিকে একবার তাকাইয়াই ঠাকুর বলিলেন, কি মা, নিঃসন্তান বুঝি ?

বেলা ও ভজহরি উভয়েই প্রশ্ন শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেল। ঠাকুর

তাহা হইলে দেখিবামাত্র মনের কথা জানিয়া ফেলিয়াছেন। কিংবা এখানে অনেকেই তো সন্তানকামনায় পূজা দিতে আসে, কাজেই ঠাকুর অন্ধকারেই ঢিল ছুঁড়িয়াছেন এবং ভাগ্যক্রমে তাহা যথাস্থানে লাগিয়া গিয়াছে। সুতরাং হঠাৎ বেশি ভক্তি দেখানো ঠিক হইবে না।

বেলা বেশ শান্ত স্বরেই বলিল, হ্যাঁ বাবা।

আচ্ছা মা, দেখি হাতখানা।

ভজহরি বলিল, হাত দেখাতে আপনাকে দক্ষিণা কি দিতে হবে?

আমার কিছুই দাবী নেই। মায়ের পূজার জন্যই আমার এখানে আসা। মা যদি ইচ্ছে করেন, তবে আমার হাত দিয়ে তাঁর ভক্তকে কৃপা করতে পারেন। তাই আমার সামান্য শক্তি নিয়ে এখানে মায়ের ভক্তদের প্রতীক্ষায় বসে থাকি।

বেলার হাতখানি একটু দেখিয়াই ঠাকুর বলিলেন, কি আশ্চর্য!

কি আশ্চর্য ঠাকুর?

আপনারা কি হিন্দু?

হ্যাঁ, আমরা হিন্দু।

কি আশ্চর্য!

কি আশ্চর্য ঠাকুর, বলুন না?

হাতে যা লক্ষণ দেখছি, তাতে মুখে বলতে বাধছে।

কি বলুন না, আমার বড় ভয় করছে।

না, না, ভয়ের কিছু নয়। মানে, মা, তোমার কি পূর্বে আর একটি স্বামী ছিল?

বেলার মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। ভজহরি ঠাকুরের কথায় উত্তর দিল—হ্যাঁ, ওঁর পূর্বস্বামী বিবাহের পরদিনই স্বর্গে যান। তার পর কয়েক বৎসর পরে আমি ওঁকে বিবাহ করেছি।

বেলা ও ভজহরি ঠাকুরের এই অতীতবাণী শুনিয়া বিস্মিত ও কতকটা যেন বিমূঢ় হইয়া গেল। কেমন করিয়া ইনি এসব খবর জানিলেন। জীবনে কখনও ইহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নাই। তাছাড়া কখনও অন্য কোন সাধু-সন্ন্যাসীকেও বেলা বা ভজহরি হাত দেখায় নাই বা তাহাদের সঙ্গে কোন আলাপ আলোচনা করে নাই। সুতরাং ঠাকুরের এই হাত দেখা এবং হাত দেখিয়া গত জীবনের সংবাদ বলা, ইহার পশ্চাতে নিশ্চয়ই কোন হস্তরেখাঘটিত বৈজ্ঞানিক সাধনা আছে, অথবা যাহাকে সাধারণ ভাষায় আমরা দৈব বা অলৌকিক শক্তি বলি, তেমনি একটা কিছু আছে। ভবিষ্যদ্বাণী সত্য কি মিথ্যা তাহার প্রমাণ ভবিষ্যৎকালের উপর নির্ভর করে। কিন্তু অতীতের সম্বন্ধে অজ্ঞাত তথ্যের উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সত্যতা প্রমাণ হইয়া যায়। এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে অজ্ঞাতসারেই বেলা ও ভজহরির মনে গণক ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধার উদয় হইল এবং তাহারা আরও ঘনিষ্ঠভাবে তাঁহার কাছে নিজেদের ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানা প্রকার কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

ভজহরি চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বেলা তাহার বাঁ হাতখানি আবার ঠাকুরের দিকে বাড়াইয়া দিল। ঠাকুর বাঁ হাতখানি ধরিয়া ডান হাত দিয়া একখানি খড়ির সাহায্যে মাটিতে নানাপ্রকার দাগ কাটিতে লাগিলেন। চৌকো, গোল, ত্রিকোণ নানাপ্রকার চিত্র আঁকিতে লাগিলেন এবং মাঝে মাঝে বেলার হাতের দাগগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন। ঐ চিত্রগুলির মধ্য হইতে একটি চতুষ্কোণ ক্ষেত্র বাছিয়া লইয়া তাহার মধ্যে একটি করিয়া রেখা টানেন, আবার বেলার হাতের দিকে চাহিয়া তাহা মুছিয়া ফেলেন। দাগটি মুছিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া ধ্যান করেন, আবার বেলার হাতের দিকে নিরীক্ষণ

করেন, আবার একটি দাগ আঁকেন, একটু পরে তাহা আবার মুছিয়া ফেলেন। এমনি করিয়া কিছুক্ষণ দাগ আঁকা ও দাগ মোছা চলিবার পর একটি দাগ চৌরঙ্গীর দিকে টানিয়া ঠাকুর মহাশয় নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। বেলা উৎকণ্ঠিত মনে ধৈর্যসহকারে ঠাকুরের দাগ আঁকা দেখিতেছিল। সেও ঠাকুরের মুখে আর একটা সত্য বাণী শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর ঠাকুর বলিলেন, মা, তোমাদের বাড়ী বুঝি এই দিকে ?

এই কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর শেষ-আঁকা চৌরঙ্গীমুখো রেখাটি দেখাইয়া দিলেন। ভজহরি ও বেলা সবিস্ময়ে দেখিল, ঠিকই তো। এই দাগটি সোজা প্রডিউস করিয়া দিলে, মানে সোজা লম্বা করিয়া টানিয়া লইয়া গেলে খুব সম্ভব তাহাদের বিবেকানন্দ রোডের বাড়ীতে গিয়াই ঠেকিবে। কি আশ্চর্য গণনা ! ভজহরি ও বেলা প্রায় গলিয়া গেল ! তাহারা ভক্তিগদগদ চিত্তে ভাবিতে লাগিল, এতদিনে তাহাদের সত্যই একটি মহাপুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ মিলিয়াছে। আমাদের দেশের কি দুর্ভাগ্য ! এমন দৈবশক্তিসম্পন্ন লোকের কথাও লোকে অনেক সময় হাসিয়া উড়াইয়া দেয়। এদের নিয়ে কত ঠাট্টা তামাসা করে ! আণবিক বোমার আবিষ্কার নিয়ে সারা জগতে হৈ হৈ পড়ে গেছে, অথচ এই আণবিক বোমায় কে মরবে, কে মরবে না, সে কথা যারা দশ বছর বা বিশ বছর আগে থেকেই নির্ভুল গণনা করে বলে দিতে পারেন, সে সব মহাপুরুষের কেউ খোঁজই নেয় না। ভজহরি ও বেলার ইচ্ছা হইল সটান শুইয়া পড়িয়া ঠাকুরের পা দু'খানি জড়াইয়া ধরে, কিন্তু আশেপাশে নানা শ্রেণীর লোকের উপস্থিতির জন্য লজ্জার মাথা খাইয়া অতটা পারিয়া উঠিল না। মনটা কিন্তু গলিয়াই রহিল।

বেলা আস্তে আস্তে তার বাঁ হাতখানি আবার বাড়াইয়া দিল ঠাকুরের দিকে, যদি আরো একটা বাণী শোন যায়, এই আশায়। ঠাকুর নিজের বাঁ হাতে বেলার হাতখানি ধরিয়া ডান হাত দিয়া আবার আঁকা ও মোছা আরম্ভ করিলেন। মাঝে মাঝে বেলার হাত ছাড়িয়া দিয়া একখানি পুঁথির পাতা উল্টাইতে থাকেন। আবার দাগ আঁকেন, বেলার হাতের রেখা পরীক্ষা করেন, একখানা শ্লেটে দুইটি যোগ এবং তিনটি বিয়োগের আঁক কষেন। উত্তরটি তুলিয়া লইয়া চতুষ্কোণ ক্ষেত্রের মাঝখানে লেখেন। একটি সমকোণী ত্রিভুজ আঁকিয়া তাহার কর্ণের উপর এই সংখ্যাটি লিখিয়া তাহার বর্গফল বাহির করেন। তাহাকে দুইভাগ করিয়া একটিকে এক বাহুর উপরে, অপরটিকে অপর বাহুর উপরে লেখেন। যখন দেখেন কোনটাই বর্গফল হয় নাই, তখন সমস্ত ত্রিকোণটিকেই মুছিয়া ফেলেন—এমনি করিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া আঁকা, মোছা, লেখা, মোছা, হাত ধরিয়া দেখা, হাত ছাড়িয়া দেওয়া, প্রভৃতি প্রক্রিয়ার পর ঠাকুর বলিলেন, আচ্ছা মা, তোমাদের বাড়ীর নামের মধ্যে দুইটি 'ব' আছে ?

ঠিকই তো। 'বিচালি-ভবন' নামের মধ্যে দুইটি 'ব' আছে। কি অদ্ভুত! ঠাকুরের কি অলৌকিক শক্তি! যদি তিনি বলিতেন, বাড়ীর নাম 'বিচালি-ভবন' তাহা হইলে হয়ত মনে করা যাইত, লোকটি জুয়াচোর। কোনদিন বিবেকানন্দ রোড দিয়া যাইবার সময়ে বাড়ীর নাম-লেখা পাথরের ফলক দেখিয়া আসিয়াছে। কিন্তু ইনি যখন বলিতেছেন, বাড়ীর নামের মধ্যে দুইটি 'ব' আছে, তখন বুঝিতে হইবে, ইনি অলৌকিক ঐশী শক্তির অধিকারী। সুতরাং ইনি শুধু বিশ্বাস্য নহেন, নমস্য ও পূজনীয়।

বেলা ও ভজহরি একান্তে একটু পরামর্শ করিল। তাহারা স্থির

করিল, এরূপ মহাপুরুষ ব্যক্তির সহিত এখানে এইভাবে ক্ষণিক আলাপ করিয়াই ক্ষান্ত হওয়া চলে না, ইঁহাকে বাড়ীতে লইয়া গিয়া সমাদর ও পূজা করা শুধু বাঞ্ছনীয় নয়, অবশ্য কর্তব্য। এরূপ মহাপুরুষকে বাড়ীতে পাওয়া পরম সৌভাগ্যের কথা।

ভজহরি পকেট হইতে একখানি একশত টাকার নোট ঠাকুরের পায়ের কাছে রাখিয়া, তাঁহাকে তাহার বিচালি-ভবনের ঠিকানা দিয়া, পরবর্তী রবিবারে অবশ্য পদধূলি দিবেন এইরূপ প্রতিশ্রুতি লইয়া, বেলার সহিত মোটরে উঠিয়া বাড়ী ফিরিল।

৩

রবিবার। বেলা ও ভজহরি গণকঠাকুরের আগমনের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। সেদিন কালীঘাট হইতে ফিরিবার পর শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত বেলা তাহার পরিচিত এবং আত্মীয়-বন্ধু সকলকেই গণকঠাকুরের সংবাদ দিয়াছে এবং যদি কাহারও কিছু জানিবার আগ্রহ থাকে এবং গণকঠাকুরের প্রতি বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে তাহাকে উপস্থিত থাকিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়াছে। রবিবার দ্বিপ্রহরের পর গণক মহাশয়ের আসিবার কথা। বেলা দশটা এগারটা হইতেই লোক সমাগম আরম্ভ হইয়াছে। বেলার মাসীমা আসিয়াছেন—বিবেকানন্দ রোডেই তো তাঁর বাসা। তিনি তাঁহার সঙ্গে তিন চারিজন আত্মীয় ও আত্মীয়া লইয়া আসিয়াছেন। ভজহরিও নিমন্ত্রণ করিয়াছে কয়েকজন বন্ধুকে। তাঁহাদের সঙ্গে আসিয়াছেন কয়েকজন মহিলা ও তরুণী।

একখানি বড় ঘরের মাঝখানে কার্পেট পাতা হইয়াছে। সেখানেই গণকঠাকুর বসিবেন। এই ঘরে আর কাহারও বসিয়া থাকিবার ব্যবস্থা নাই। শুধু যিনি গণকঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন, তাঁহার জন্য

কার্পেটের পাশেই স্থান নির্দিষ্ট করা আছে। কত জনে কত মনের কথা বলিবে, কত গোপন কথা, কত গোপন বাণী, গণকঠাকুর গণনা করিয়া বলিবেন, সে সব কথা শুধু যার একান্ত আপন কথা, তিনি ছাড়া অন্যে শুনিবে কেন? তাই ব্যবস্থা করা হইয়াছে, এই ঘরের দুই পাশে দুইখানি ঘরে অভ্যাগতেরা বসিয়া অপেক্ষা করিবেন। একঘরে ধুতী, পাঞ্জাবী, পেণ্টুলন; অন্য ঘরে শাড়ী, শেমিজ, ফ্রক। পর্যায়ক্রমে এক একজন করিয়া আসিয়া গণকঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন।

ঘড়িতে যখন টং টং করিয়া দুইটা বাজিল, তখন গণকঠাকুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একখানি রিক্‌শ হইতে নামিবামাত্র ভজহরি ও বেলা আগাইয়া আসিয়া পদধূলি লইল এবং সমাদর করিয়া তাঁহাকে উপরে লইয়া গিয়া কার্পেটের উপর বসাইল। দুইপাশের দুইঘর হইতে খস্ খস্, ফিস্ ফাস্, টুং-টাং, রিংটিং শব্দসহ অনেকগুলি চোখ গণকঠাকুরকে একবার দেখিয়া লইল। একগ্লাস সরবৎ আস্তে আস্তে চুমুক দিয়া খাইয়া ঠাকুর মহাশয় নিস্তব্ধ হইয়া বসিলেন। দুইপাশের দুই ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া ভজহরি বাহির হইয়া গেল।

ফিন্‌ফিনে পাঞ্জাবী-পরা চশমা চোখে এক ভদ্রলোক সর্বপ্রথম হাত দেখাইবার জন্য আসিয়া গণকঠাকুরের সম্মুখে বসিলেন। বহুদিন হইতে বাসনা একবার ইউরোপ ও আমেরিকা ঘুরিয়া আসিবেন। কিন্তু একের পর আর এক বাধা আসিয়া পড়ায় তাঁহার যাত্রা করা হইতেছে না। তাই হাত দেখাইতে আসিয়াছেন, যাওয়া আদৌ হইবে কি না এবং হইলে কবে হইবে। হাত দেখিয়া গণকঠাকুর বলিলেন, আপনাকে শীঘ্রই বিস্তীর্ণ জলরাশির উপরে দিনাতিপাত করিতে হইবে। প্রশ্নকর্তা খুশী হইয়া উঠিয়া গেলেন।

এবার বিপরীত দিক হইতে একটি বর্ষীয়সী মহিলা আসিয়া ঠাকুরকে

প্রণাম করিয়া নিজের বাঁ হাতখানি বাড়াইয়া দিলেন এবং করুণস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি আজ দশবছর যাবৎ অম্বলের অসুখে ভুগছি, কোন ওষুধে কিছু হয় না। এ অসুখ কি আমার সারবে না ?

নিশ্চয়ই সারবে। ছ'মাসের মধ্যেই সেরে যাবে। তৈল, লঙ্কা, আচার আর ভাজাভুজি খাবে না। আর রোজ দু'বেলা ঠিক এক সময়ে ভাত খাবে।

এসব কথা তো ডাক্তারেরা বলে।

তোমার হাতেও ঐসব কথাই লেখা আছে।

আচ্ছা বাবা, আসি।

এবার আসিলেন অন্য ঘর হইতে চাপকান পরা এক ভদ্রলোক। তিনি নূতন শেয়ার বাজারে ঢুকিয়াছেন। সম্প্রতি একটি দালালের পাল্লায় পড়িয়া কিছু মোটা রকম ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট করিয়া অনিদ্রা ও হৃদরোগে ভুগিতেছেন। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া প্রশ্ন করিতেই গণকঠাকুর মহাশয় হাতখানি দেখিয়া বলিলেন, ফল অর্ধ অর্ধ।

বুঝলাম না তো ঠাকুর মশায় ?

মানে, ঠকবেনও না, জিতবেনও না।

কিন্তু, আমি তো ঠাকুর বড় আশা করে—

তোমার হাতের রেখায় আশা-নিরাশার কোন চিহ্নই নেই।

তাহলে কি আমি শূন্যেই ঝুলবো ?

আপাতত।

তা'হলে আসি।

আসুন।

তারপর আসিলেন একটি মহিলা। পরনে কালোপাড় টাঙ্গাইল শাড়ী, হাই-হিল জুতো, হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ। পা-জোড়া একপাশে

রাখিয়া হাঁটু ভাঙ্গিয়া বাঁ হাতের উপর ভর দিয়া বসিলেন এবং ব্যাগটি পাশে রাখিয়া ডান হাতখানা বাড়াইয়া দিলেন গণকঠাকুরের দিকে। গণকঠাকুর হাত দেখিতে লাগিলেন এবং মহিলাটি বলিয়া যাইতে লাগিলেন, তিনি বি, এ পাশ করিবার পর ক্রমাগত বহুস্থানে চাকরির দরখাস্ত করিয়াছেন, কিন্তু কোথাও সদুত্তর পাইতেছেন না। তাঁহার ললাটে কি আছে, তাহা যদি ঠাকুর মহাশয় বলিয়া দেন, তাহা হইলে তিনি অত্যন্ত বাধিত হইবেন। ঠাকুর মহাশয় বলিলেন, তোমাকে চাকরি করতে হবে না। তোমার হাতে দেখছি গৃহিণী-রেখাটি খুব স্পষ্ট। তুমি শিগ্‌গিরই উপযুক্ত স্বামীর ঘরণী হবে। আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ডানহাত দিয়া ঠাকুরের চরণ স্পর্শ করিয়া, সোজা হইয়া ব্যাগের ভিতর হইতে রুমাল বাহির করিয়া মুখখানি ভাল করিয়া মুছিয়া লইয়া তিনি ঠাকুর মশায়কে আর একবার ধন্যবাদ দিয়া প্রস্থান করিলেন।

অন্য ঘর হইতে আসিলেন এক বৃদ্ধ। ঠাকুরের চরণধূলি লইয়া কানে কানে মৃদুস্বরে বলিলেন, কথাটা একটু গোপনীয়।

বেশ তো। এখানে তো আপনি আর আমি। আর তো কেউ নেই।

দেখুন, আমার দ্বিতীয় পত্নীবিয়োগের পর থেকে কিছুতেই আর একটি তৃতীয়া সংগ্রহ করতে পারছিনে। দেখুন তো ভাগ্যে কি আছে?

আপনার হাতখানা তো খাসা। পাণিগ্রহণের পক্ষে এমন চমৎকার পাণি সচরাচর দেখা যায় না। আপনি ব্যস্ত হবেন না। মনে হয়, এক বৎসরের মধ্যেই আপনার আশা পূর্ণ হবে।

বৃদ্ধ গদগদ চিত্তে নমস্কার করিয়া একখানি এক শত টাকার নোট গণকঠাকুর মহাশয়ের আসনের নীচে রাখিয়া বাহির হইয়া আসিলেন।

এবার আসিল অপর দিক হইতে একটি নব-বিবাহিতা তরুণী। খুট খুট শব্দে পা ফেলিতে ফেলিতে, বাঁ হাতে এক গোছা নূতন চূড়ীর শব্দ

করিতে করিতে এবং ডান হাতে ঘন ঘন মুখ মুছিতে মুছিতে ঠাকুরের সামনে আসিয়া ধপ করিয়া বসিয়া পড়িল এবং নমস্কার করিতে ভুলিয়া গিয়া ঠাকুরকে সোজা জিজ্ঞাসা করিল, দেখুন আমার স্বামী আমাকে ভয়ানক বিরক্ত করেন। দেখুন তো হাতখানা, কোন প্রতিকার আছে কি না।

ঠাকুর মহাশয় হাতখানি দেখিয়া বলিলেন, কোন ভয় নেই মা। তোমার হাতের রেখা অতি চমৎকার। তিন বৎসর তোমার স্বামী তোমাকে বিরক্ত করবেন। তারপর সারাজীবন তুমি তাকে বিরক্ত করবে।

থ্যাঙ্কস্। নমস্কার।

তারপর আসিলেন কোট-প্যাণ্ট পরা ছিপছিপে এক ভদ্রলোক। যথারীতি নমস্কার করিয়া গণকঠাকুরের পদপ্রান্তে বসিয়া বলিলেন, ঠাকুর, আমার তো আজ কয়দিন ঘুম হইতেছে না।

দেখি হাতখানা। কই ঠিক অনিদ্রা রোগের লক্ষণ তো হাতে নেই।

হাতে না থাকতে পারে, কিন্তু মনে আছে।

মনটা আমার কাছে উন্মুক্ত করতে তো কোন বাধা নেই।

আজ্ঞে না। দেখুন, এবারকার বিরাট অফারে আমি একটা ক্রসওয়ার্ড পাজ্‌লের সমাধান পাঠিয়েছি। তাতে ভুল হয়েছে কিনা, কটা ভুল হয়েছে, জানবার জন্য মনটা অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে গেছে। দেখুন তো হাতখানা একবার। সঙ্কোচ করবেন না, ভাল করে সাবান দিয়ে খুব পরিষ্কার করে ধুয়ে এসেছি।

কিন্তু, ফল তো কয়েকদিন পরেই বেরুবে।

তা তো বেরুবে। কিন্তু আমার তো ধৈর্য নেই। দেখুন না দয়া করে—

হাতখানা তো খুবই পরিষ্কার। কিন্তু—

কিন্তু কি, ঠাকুর মশায় ?

কিন্তু প্রাইজ পেতে হ'লে যে কটা ভুল হওয়া দরকার, তার চেয়ে একটা ভুল বেশি আছে তোমার সমাধানে।

'অ্যাঁ' বলিয়া ভদ্রলোক প্রায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

ঠাকুর মহাশয় আদর করিয়া সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, বাছা, এত সহজে আশা ছাড়লে কি চলে ? জুয়া যখন ধরেছ, তখন জোরসে চালিয়ে যাও। আজ না হয় কাল, এবছর না হয় আগামী বছর, এ জন্মে না হয় পরজন্মে, ফল পাবেই পাবে। সেই আশায় বুক বেঁধে চালিয়ে যাও সমাধান পাঠানো। খাসা হাতখানা তোমার, কিছু ভাবনা নেই।

আচ্ছা, আসি তাহলে, নমস্কার।

এমনি করিয়া দুই দিক হইতে পর্যায়ক্রমে এক একজন আসিয়া হাত দেখাইয়া যাইতে লাগিলেন। কেহ কেহ বাহিরে বারান্দা প্রভৃতি স্থানে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, আবার কেহ কেহ নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া গেলেন। যাইবার পূর্বে সকলকেই বেলা বহু সমাদর করিয়া কিছু মিষ্টিমুখ করাইয়া দিল।

দুই দিকের দুইখানি ঘরই যখন প্রায় খালি হইয়া আসিয়াছে, তখন গণকঠাকুরের আসনের তলা রীতিমত ভরিয়া আসিয়াছে। যাঁহারা হাত দেখাইতে আসিয়াছেন, দুই একজন ছাড়া কেহই খালি হাতে আসেন নাই। হাত দেখানর ফি বলিয়াই হোক, বা সাধু দর্শন শুধু হাতে করিতে নাই বলিয়াই হোক, মোটের উপর ঠাকুর মশায়ের আজকার দক্ষিণা বেশ মোটা রকমই হইয়াছে। বেলা ও ভজহরি ভাবিতেছে, ঠাকুর কি আর এসব স্পর্শ করিবেন ? নিশ্চয়ই না। এই টাকা দিয়া সে মা কালীকে

একখানি গহনা গড়াইয়া দিবে। মা কালীর কৃপায়ই তো এই মহা-পুরুষের সাক্ষাৎ সে পাইয়াছে।

এবার যিনি আসিলেন, তিনি যুবতী কি প্রৌঢ়া, ঠিক বোঝা যায় না। শরীর কৃশ, বেশভূষা একেবারে আটপৌরে, খালি পা, পিঠের উপর চাবির গোছা, হাতে শাঁখা, কপালে সিন্দুর। গণকঠাকুর মহাশয়ের কাছে আসিয়া গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিয়া তাঁহার মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিয়াই চমকিয়া উঠিয়া বলিয়া ফেলিলেন, তুমি ?

গণকঠাকুর মহাশয়ও কম বিস্মিত হন নাই। চক্ষু দুইটি বিস্ফারিত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, তুমি ? তুমি এখানে ?

হ্যাঁ, আমি এখানে। বলি, এ দু'বছর—

এই চুপ, চুপ। আস্তে—

দাঁতে দাঁত চাপিয়া রমণী কহিলেন, চুপ করছি। চল না একবার বাড়ী—

বাড়ী তো যাবই। লক্ষ্মীটি, এ লোকগুলো চলে না যাওয়া পর্যন্ত একটু ধৈর্য ধরে থাক। চেঁচিও না যেন।

আচ্ছা, চেঁচাচ্ছি নে। চল না একবার বাড়ী, তোমার গণকগিরি বের করছি।

আহা-হা, অত চটছ কেন ?

না, চটবো না। এই দুটো বছর আমার যে করে কেটেছে—বলিতে বলিতে রমণীর চোখে প্রায় জল আসিয়া পড়িল।

আচ্ছা লক্ষ্মীটি, এখন ত যাও। এই কটা লোক বিদেয় হলেই আমি উঠছি।

রমণী উঠিয়া আসিলেন। যে কয়জন বাকি ছিলেন তাঁহারা একে একে হাত দেখাইতে লাগিলেন। রমণী বেলাকে একটু নিভৃত স্থানে

ডাকিয়া লইয়া বলিলেন, এ ঠাকুর মশায়কে আপনারা কোথায় পেলেন ?

এঁর সঙ্গে দেখা আমাদের কালীঘাটে। কেন, আপনি চেনেন নাকি এঁকে ?

চিনি। খুব চিনি !

আপনি বুঝি ওঁর শিষ্যা।

শিষ্যা-টিষ্যা আমি কারো নই। উনি আমার স্বামী।

আপনার স্বামী। বলেন কি ? উনি তাহলে সন্ন্যাসী নন ?

সন্ন্যাসী ওঁর চৌদ্দ পুরুষের মধ্যে কেউ নেই।

ব্যাপারটা তো ঠিক বুঝতে পারছি নে।

উনি ছিলেন রহিমপুর ষ্টেশনের গুড্‌স্ ক্লার্ক। লোকে বলত মালবাবু। ওখানকার একজন বিচালি ব্যবসায়ীর মাল চালান দেবার সময়ে একগাড়ী মাল দশ গাড়ী পনর গাড়ী বলে চালান দিয়ে কিছু পয়সা করেছিলেন। তারপরে যখন হিসেব নিকেশের সময় এল, তখন দিলেন গা-ঢাকা। তারপর এই প্রথম দেখা ওঁর সঙ্গে।

কি আশ্চর্য ! উনিই সেই মালবাবু। তাঁকে তো আমি খুব চিনতাম ! আমাদের উনিই তো বিচালির ব্যবসা করেছিলেন রহিমপুরে। সেই জন্যই তো আমাদের বাড়ির নাম রেখেছি 'বিচালি ভবন।'

আপনার সঙ্গে যে আজ এমনভাবে আলাপ পরিচয় হবে, তা স্বপ্নেও ভাবিনি। আমি তো আমাদের পাড়ার লোকের মুখে খবর পেয়ে গণকঠাকুরের কাছে এসেছিলাম হাত দেখাতে, কবে ওঁকে ফিরে পাব জানতে।

একেবারে হাতে হাতে ফল পেয়ে গেলেন।

ইতিমধ্যে হাত দেখা পর্ব শেষ করিয়া, ভজহরি গণকঠাকুরকে বাড়ীর

মধ্যে লইয়া আসিয়াছে, বেলার কাছে। কিছু মিষ্টিমুখ করাইতে হইবে তো। সেখানে অপরিচিতা রমণীটিকে দেখিয়া ভজহরি বেলাকে জিজ্ঞাসা করিল, উনি কে ?

বেলা বলিল, ঠাকুরকেই জিজ্ঞাসা কর।

আমতা আমতা করিয়া ঠাকুর বলিলেন, উনি আমার স্ত্রী।

মানে ?

বেলা মানে বলিয়া দিল। ভজহরি ও ঠাকুর উভয়েই অবাক হইয়া কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকিবার পর গণকঠাকুর ওরফে মালবাবু ওরফে রামহরি বলিল, আমার কোন বিপদ নেই তো ?

আর বিপদ! তোমার সে খড়-কোম্পানীর মালিকরা অনেকবার গণেশ উল্টে এখন আমারই পার্টনার। সুতরাং তুমি নিশ্চিন্তমনে দক্ষিণার টাকাগুলি পকেটে পূরে গৃহিণীকে নিয়ে মনের আনন্দে স্বগৃহে প্রস্থান করতে পারো।

কলহ

বিবেকানন্দ রোডের ভজহরি সরখেল তাহার বিচালি-ভবনে বেশ ভালই ছিল। সন্তানাদি না হওয়ায় একটু মনঃকষ্ট ছিল, কিন্তু সময়ে সবই সহিয়া যায়। বাড়ী, গাড়ী, ব্যাঙ্কের টাকা এবং পত্নী বেলাকে লইয়া তাহার জীবনযাত্রা বেশ স্বচ্ছন্দগতিতেই চলিতেছিল।

কিন্তু কি একটা তুচ্ছ কারণে বেলার সহিত ভজহরির একদিন বেশ একটু ঝগড়া হইয়া গেল। ঝগড়াটা সহজে মিটিল না। ক্রমশ বাক্যালাপও বন্ধ হইয়া গেল।

স্ত্রীর সহিত মনোমালিন্য হইলে অনেক সময়ে স্বামী বিবাগী হইতে চায়। কিন্তু ভজহরির সে ইচ্ছা হইল না। সে কলিকাতায় বেলার একটা সুব্যবস্থা করিয়া একখানি ছোট চিঠি লিখিয়া রাখিয়া একদিন নিরুদ্দেশ হইল এবং সোজা নিউইয়র্কে গিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে পৌঁছিয়াই উপলব্ধি করিল যে, পত্নীর নিকট হইতে পলায়ন করিলেও, তাঁহাকে পত্র লেখা যাইতে পারে। সে লিখিল, আমার সহিত তোমার এ জীবনে আর কোন দিন সাক্ষাৎ হইবে না। সে জন্য মন খারাপ করিও না। আমি ভাল আছি। আমার ঠিকানা জানিতে চাহিও না।

কিছুদিন নানাস্থানে ঘুরিবার পর একদিন ভজহরি শুনিতে পাইল, প্রথম রকেট চন্দ্রগ্রহে যাত্রা করিতেছে, সবগুলি সীটই বহুপূর্ব হইতে রিজার্ভ হইয়া গিয়াছে। একটি মাত্র সীট বাকি। ভজহরি পূর্বে এরোপ্লেনে পাইলটের কাজ করিয়াছে। তাহার আকাশে ওড়ার অভ্যাস ছিল। এবা'র মনে করিল, একবার চাঁদেই চলিয়া যাই। যদি

ফিরিতে না পারি, নাই পারিলাম। ঘরই যখন ছাড়িয়াছি, তখন নিউইয়র্কও যা, চাঁদও তাই। এইরূপ চিন্তা করিয়াই ভজহরি গিয়া রকেটের বাকী সীটটা রিজার্ভ করিয়া ফেলিল। ভারতীয়ের অসম-সাহসিকতা দেখিয়া সকলেই পুলকিত হইল। কয়েকদিনের মধ্যেই কলিকাতার সমস্ত সংবাদপত্রে, ধন্য ভজহরি, ধন্য ভজহরি, ধ্বনিত হইতে লাগিল।

এদিকে ভজহরির যাত্রার দিন যতই সন্নিকট হইতে লাগিল, ততই বেলার জন্য তাহার মন কেমন করিতে লাগিল। ভজহরি বাঙালী, স্ত্রী-অন্ত প্রাণ। এখন কেবলই মনে হইতে লাগিল, ঝগড়াটা না করিলেই হইত; যদি আমার ভালমন্দ হয়, তাহা হইলে বেলা মনে কত কষ্ট পাইবে, ইত্যাদি। কিন্তু তাহার সঙ্কল্প শেষ পর্যন্ত অটল রহিল। যাত্রার দিনের বেশি পূর্বে সে বেলাকে কিছু লেখা সমীচীন মনে করিল না। সংবাদপত্রে সংবাদ পড়িয়া বেলা ভজহরিরর ঠিকানা সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিয়া বিফল হইয়াছে।

রকেট যেদিন যে সময়ে যাত্রা করিবে, তাহা পৃথিবীর সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। বেলা কালীঘাটে গিয়া মানত করিল। মনে মনে নিজেকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, কেনই বা ঝগড়া করিতে গেলাম! অতখানি অভিমানের কিই বা দরকার ছিল! মা কালী, আমার ভজহরিকে আমার কাছে ফিরাইয়া আনিয়া দিও।

রকেট ঠিক যখন আমেরিকার ভূমি ত্যাগ করিল, ঠিক সেই সময়ে পিওন আসিয়া বেলার হাতে একখানা চিঠি দিল। বেলা কম্পিত হস্তে চিঠিখানা খুলিয়া পড়িল।

প্রিয়তমে, খুব সম্ভব এই খানাই আমার শেষ চিঠি। খবরের কাগজে সব খবরই পেয়েছ। কেমন, আর ঝগড়া করবে? কেমন

জব্দ। শোন, আমি একটা সাতাত্তর ভ্যালভ্‌যুক্ত রেডিও রিসিভার তোমার জন্য পাঠাচ্ছি। এটা পেলেই ·০০১ মিটারে টিউন করে রাখ্‌বে। আমি পথ থেকে এবং চাঁদে পৌঁছে রেডিও-যোগে তোমাকে খবর দেবার চেষ্টা করব। অবশ্য পৃথিবী ছেড়ে বেশি দূরে গেলে গলা দিয়ে স্বর বেরুবে কি না, সন্দেহ। চাঁদে পৌঁছবার পর বাক্‌শক্তির কি অবস্থা হবে জানিনে। হয়ত স্বর বেরুবেই না, আর বেরুলেও তা মানুষের মত হবে, না ঘোড়ার মত হবে, বলতে পারি নে। একটা খুব শক্তিমান ট্র্যান্‌স্মিটার নেওয়া হচ্ছে, একটা বিরাট ব্যাটারিও। তবে কাজে কতদূর কি হবে জানিনে। শেষে বেঘোরে প্রাণটা না যায়। যাক্‌, কপালে যা আছে, তাই হবে। এখন আর ভেবে লাভ নেই। তোমার সঙ্গে আর কখনও দেখা হবে না, এইটে মনে করেই আমার সবচেয়ে কষ্ট হচ্ছে। আর কখনো তোমার সঙ্গে ঝগড়া করব না, ভালবাসা জেনো। ইতি—শুধু তোমারই ভজহরি।

পত্র পড়িয়া বেলা কিছুই করিল না। শুধু চিঠিখানি হাতে করিয়া অনেকক্ষণ অন্যমনস্কভাবে বসিয়া রহিল। তারপর মনে মনে বলিল, আচ্ছা, চাঁদে পালানো বের করছি। ইহার পর হইতে বেলার এই অস্বাভাবিক গার্হস্থ্য বিপর্যয়ের মধ্যেও তাহাকে মোটামুটি সুস্থ ও অবিচলিতই দেখা গেল।

এদিকে ভজহরি নির্বিঘ্নে চাঁদে পৌঁছিয়া গিয়াছে। রকেটটির মুখের কাছে ছত্রিশটি হেলিক্যাল স্প্রীং এবং তৎসহ শক্‌-অ্যাবজরভার বসানো ছিল। রকেটটি যখন চাঁদের কাছে আসে, তখন যাত্রীদের মধ্যে 'ঐ চাঁদ, ঐ চাঁদ' বলিয়া একটি রব উঠে, এবং তাহারা বেশ শক্ত হইয়া নিজ নিজ আসনে বসেন। রকেটের নাকটি চাঁদের গায়ে ঠেকিবামাত্র, রকেটটি দুলিয়া দুলিয়া ছত্রিশবার নাচিয়া স্থির হইয়া শুইয়া পড়িল। যাত্রীদের গায়ে

কোনরূপ ঝাঁকানি লাগিল না। চাঁদকে নিকট হইতে দেখিয়া ভজহরি মনে মনে বলিয়া উঠিল, এই নাকি চাঁদ! এ তো দেখছি প্রকাণ্ড একখানা ঝামা। হায় হায়, এরই সঙ্গে আমার বেলার মুখের তুলনা করেছি! ছিঃ, এমন কাজ কেউ করে!

ভজহরি যেখানটায় নামিয়াছে, সেখানটা সকাল, একটু বেলা হইয়াছে মাত্র। ভজহরি দেখিল সে যেন অত্যন্ত হাল্কা হইয়া গিয়াছে। পা যেন আপনিই মাটি হইতে উঠিয়া আসে। অবশ্য স্ত্রী দূরে থাকিলে শরীর মন সবই বেশ হাল্কা থাকিবারই কথা। কিন্তু এ যেন তার চেয়েও বেশি। পৃথিবীতে যেটা এক সের, এখানে যেন সেটা এক তোলা। এখানে পৌঁছিয়াই রেডিও-যোগে ভজহরি বেলাকে জানাইল, নিরাপদে পৌঁছিয়াছি, ভাল আছি।

ভজহরি এবং অন্যান্য যাত্রীরা যে যেখানে পারিল এক একটা স্থান খুঁজিয়া লইল। কথা রহিল, ফিরিবার দিন আবার সকলে একত্রিত হইবে। রকেটটি পাহারা দিবার জন্য দুএকজন মিস্ত্রী উহার নিকটেই তাঁবু ফেলিয়া রহিল।

ভজহরি প্রথমে একটি ছোট হোটেলে গিয়া উঠিল। কিন্তু যখন শুনিল যে রকেটটির কল বিগড়াইয়া গিয়াছে এবং ওটা আর চাঁদ ছাড়িয়া যাইতে চাহিতেছে না, তখন হোটেল ছাড়িয়া একটি ভদ্রলোকের বাড়ীতে পেয়িং গেষ্ট হিসাবে বাস করিতে লাগিল। প্রথমত পরস্পরের ভাষা না বুঝিবার জন্য একটু অসুবিধা হইয়াছিল, কিন্তু কয়েকদিন পরেই কাজচলা-গোছের একটা ব্যবস্থা হইয়া গেল, যেমন আমাদের হয় ইটালিতে, জার্মানীতে বা ফ্রান্সে। পৃথিবীর টাকা ওখানে চলিবে না বলিয়া ভজহরির একটু আশঙ্কা ছিল, কিন্তু ওখানকার লোকেরাও বুদ্ধিমান। তাহারা যখন দেখিল পৃথিবীর মত একটা ধনী, মানী, জ্ঞানী

গ্রহের সঙ্গে আদান-প্রদান আরম্ভের সূত্রপাত হইতেছে, তখন তাহারা অতি সমাদরের সঙ্গে সঙ্গেই ডলারকে অভ্যর্থনা করিয়া লইল।

কিছুদিন পরেই ট্র্যান্স্মিটারটিও অকর্মণ্য হইয়া গেল। ভজহরি আর বেলাকে কোন খবর পাঠাইতে পারে না। রকেট ফিরিয়া না আসাতে এবং রেডিওতে কোন খবর না পাওয়াতে আমেরিকায় এবং সমস্ত পৃথিবীতে একটা দুঃখের ছায়া নামিয়া আসিল। রকেটের চাঁদে পৌছানর খবর আসাতে বৈজ্ঞানিকরা যেমন উৎফুল্ল হইয়াছিলেন, এখন তেমনি হতাশ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু নিরুৎসাহ হইলেন না। পুনরায় আর একটি রকেট প্রেরণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

ভজহরির রকেটে কয়েকজন বৈজ্ঞানিক এবং শিল্পপতি ছিলেন। তাঁহাদের পক্ষে রকেটের ফিরিয়া আসিবার শক্তি-লোপটা শাপে বর হইল। তাঁহারা চারিদিকে তৈল, কয়লা, লোহা, সোনা, প্রভৃতির সন্ধানে ছুটিলেন এবং কিছু দিনের মধ্যেই একটি বিরাট বিদ্যুৎ উৎপন্ন করিবার কারখানা স্থাপন করিয়া ফেলিলেন। সেখানকার দিনের পরিমাণ আপাতত যাত্রীদের ঘড়ি দেখিয়া পার্থিব মতেই চলিতে লাগিল।

ভজহরির বড়ই মুস্কিল হইল। সে বৈজ্ঞানিক নয়, দার্শনিক নয়, ব্যবসায়ী নয়, এক কথায় কোন গুণ নাই তার। এদিকে ডলারগুলিও ফুরাইয়া আসিতেছে। যে বাড়ীতে সে পেইং গেষ্ট, সে বাড়ীর মালিক এবিষয়ে একবার ভজহরিকে একটু আভাসও দিয়াছেন। এদিকে পৃথিবীর তো কোন খবরই নাই। না আছে রিসিভার, না আছে ট্র্যান্সমিটার। বেলার সঙ্গে সাক্ষাৎ বা মিলনের আশাও নির্মূল হইয়াছে। এ অবস্থায় ভজহরি কি করিতে পারে? কি তাহার করা উচিত? কে তাহাকে পরামর্শ দিবে? কে তাহাকে সান্ত্বনা দিবে? ভজহরি যাঁহার অতিথি, তিনি একজন মোক্তার। সৎপরামর্শদানই তাঁহার

ব্যবসায় ও অভ্যাস। তিনি একদিন—অর্থাৎ একসময়ে—ভজহরিকে ডাকিয়া বলিলেন, কিছু ঠিক করলেন?

কি আর ঠিক করব, মাথা আর মুণ্ডু। এমন বেঘোরে পড়ব, তা কি জানতাম? ও রকেট যে আর ফিরবে, তার তো কোন আশা দেখছি নে।

আপনি যদি আমার পরামর্শ শোনেন—

শুন্‌বার মত হলে নিশ্চয়ই শুন্‌ব।

আপনি বিয়ে করে চাঁদেই বসবাস করুন। পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে ফেলুন!

ও! কি ভয়ানক কথা। এমন কথা আপনি বলতে পারলেন? পৃথিবীকে ভুলব? আমেরিকাকে ভুলব? ভারতবর্ষকে ভুলব? বাংলা-দেশকে ভুলব? কলকাতাকে ভুলব? বিবেকানন্দ রোড ভুলব? বেলাকে ভুলব? অসম্ভব।

মোক্তারবাবু বুঝিলেন, ঔষধ ধরিয়াছে। সেদিন আর কিছু বলিলেন না।

ভজহরির মনে নানা ভাবের তরঙ্গ উঠিতে লাগিল। আবার বিবাহ! তাও কি সম্ভব? স্ত্রীর মৃত্যুর পরে যদি বিবাহ করা যায়, তাহা হইলে স্ত্রী অপ্রাপ্য হইলে কেন বিবাহ করা যাইবে না? কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যুর পরও তো অনেকেই বিবাহ করে না। করে। যাহারা একবার স্ত্রীর ভালবাসা পাইয়াছে, তাহারা আবার তাহা পাইতে চায়। আর যাহারা স্ত্রীর কাছে ভালবাসার পরিবর্তে পায় ছলনা, চাতুরী আর গঞ্জনা, তাহারাই ভাগ্যক্রমে একবার নিষ্কৃতি পাইলে আর বেলতলায় যাইতে চায় না। নাঃ, যুক্তিটা ঠিক হইল না। মোট কথা বেলা ছাড়া আর কাহাকেও ভজহরি ভালবাসিতে পারিবে না।

মোক্তারবাবু কিন্তু স্থান কাল বুঝিয়া ভজহরিকে ভজাইতে লাগিলেন।

একদিন বলিলেন, আমার তো আর ছেলে হল না। ঐ একটি মেয়ে—মালিকা। এই তো এবার আঠারয় পড়ল। এ গ্রহে একটা ভাল পাত্র তো খুঁজে পাচ্ছি নে। আপনাকে দেখে খুব আশা হয়েছিল, পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ হলে পৃথিবীতে একটা সৎপাত্রের সন্ধান করব। চাঁদের ছোঁড়াগুলো ভারি ইয়ে।

আর একদিন আস্তে আস্তে বলিলেন, আমার বিষয় আশয় যা আছে, সবই তো মালিকাই পাবে। সেদিন খবর পেলাম, পৃথিবীর সাহেবরা নাকি আমারই জমিতে একটা লোহার খনি আবিষ্কার করেছে। তারা বলে, যদি তাদের অনুমান ঠিক হয়, তাহলে আমাকে বছরে এক কোটি ডলার রয়ালটি দেবে। হলে কি হবে? মালিকাকে একটা সৎপাত্রে না দেওয়া পর্যন্ত আমার মনে কোন সুখ নেই।

ভজহরির মন পৌষমাসের চিঁড়ার মত ক্রমশঃ ভিজিতে ভিজিতে একেবারে গলিয়া গেল। মালিকা যে বেলার মতই ভালবাসিবে না, এমন কথা কে বলিল? চাঁদীয়ানী মেয়েরা একটু বেঁটে, রংটাও তেমন উজ্জ্বল নয়। তা হোক গে, লোহার খনির রয়ালটিতে সব ঢাকা পড়িয়া যাইবে। খাইতে বসিয়া মাঝে মাঝে মালিকাকে ভজহরি দেখিয়াছে। মোটের উপর বেশ মেয়েটি। বেশ নম্র অথচ বেশ বুদ্ধিমতী, অর্থাৎ সকলেই যেরূপ চায়, ঠিক সেইরূপ। পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিবার বা বেলার সহিত সাক্ষাতের যখন আর সম্ভাবনাই রহিল না, তখন মালিকাকে বিবাহ করিয়া চাঁদেই বসবাস করিয়া জীবনটা কাটাইয়া দিতে হইবে। ভজহরি অনেক চিন্তা করিল। কিন্তু মোক্তারবাবু ভজহরির সহিত মালিকার বিবাহ দিবেন কি? এখনও তো স্পষ্ট করিয়া কিছু বলেন নাই।

ভজহরিকে আর বেশি অপেক্ষা করিতে হইল না। ভজহরির মন বেশ প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে বুঝিতে পারিয়া মোক্তারবাবু একদিন খাইবার

সময়ে কথাটা স্পষ্ট করিয়াই পাড়িলেন এবং ভজহরিও স্পষ্টভাষাতেই তাহার সম্মতি জানাইয়া দিল।

বিবাহের সময় স্থির হইয়া গেল। মালিকার মনের কথা জানা গেল না। পাড়ার একটি উকিলের ছেলের সঙ্গে বিবাহের কথা মালিকার মাতা উত্থাপন করিয়াছিলেন, মনে মনে মালিকারও নাকি মত ছিল, কিন্তু মোক্তারবাবু ভজহরি আসিবার পর হইতেই সে প্রস্তাব চাপা দিয়াছেন। তিনি স্ত্রীকে বলিয়াছেন, মোহনের সঙ্গে মালিকার বিয়ে আমি দেবো না। আমার সব বিষয় সম্পত্তি গ্রাস করবে ওই নিধিরাম উকিলটা, সে আমার সইবে না। তাছাড়া পৃথিবীর ছেলেরা চাঁদের ছেলেদের চেয়ে ঢের বেশি উন্নত, সব দিক দিয়ে। শেষ পর্যন্ত তাঁহার স্ত্রীও মত দিলেন। বিবাহের আয়োজন উদ্যোগ চলিতে লাগিল।

এদিকে আমেরিকার বৈজ্ঞানিকেরা এবং টাকার কুম্ভীরেরা পুনরায় রকেট পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। এবার চন্দ্রগামী রকেটের পিছনে, ফিরিয়া আসিবার জন্য আর একখানি রকেট জুড়িয়া দিলেন। মাঝে ত্রিশটি স্প্রীংযুক্ত একটি বাফার। একখানি মোটরকারের পিছনে অনুরূপ আর একটি মোটরকারের মত এই রকেটটি চাঁদে গিয়া পৌঁছিলে, সেখান হইতে এখানাকে সম্মুখের রকেট হইতে বিযুক্ত করিয়া পৃথিবীতে ফিরাইয়া পাঠানো যাইবে। যাইবার সময়ে ইহার সমস্ত কলকব্জাই স্থির এবং অব্যবহৃত থাকায়, ইহার কল খারাপ হইবার বা শক্তিহ্রাস হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

ভজহরির আজ বিবাহের দিন। সকাল হইতেই বিবিধ প্রকার আয়োজন অনুষ্ঠান, উৎসব চলিয়াছে। ইণ্টার-গ্রহ বিবাহ দেখিবার জন্য চাঁদের সর্বত্র একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। ক্রমশঃ বিবাহের লগ্ন আসন্ন হইল। ভজহরি সাজিয়া গুজিয়া চন্দন পরিয়া প্রস্তুত হইল। ভজহরির

মনে একটা দুঃখ এই যে এ বিবাহে সে নিজে ছাড়া বরপক্ষের আর কেহই উপস্থিত নাই। তা আর কি করা যাইবে।

শঙ্খধ্বনি হইতেছে, উলুধ্বনি হইতেছে, ভজহরি ধীরে ধীরে আল্পনা দেওয়া পিড়ির দিকে অগ্রসর হইতেছে, এমন সময়ে বাড়ীর বাহিরে একটা মৃদু গোলমাল শুনিয়া সকলেই উৎকর্ণ হইয়া থামিয়া গেলেন। একটু পরেই দেখা গেল, একটি স্ববেশা মহিলা ব্যাগ হাতে করিয়া বাড়ীর অন্দর মহলে ঢুকিয়া পড়িয়াছেন এবং ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'কই, ভজহরি কই ?'

ভজহরি বেলাকে দেখিয়াই বিস্মিত, চমকিত এবং হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বেলা গম্ভীর স্বরে বলিল, কাপড় চোপড় ছেড়ে, মুখ হাত ধুয়ে, আমার সঙ্গে এস।

ভজহরি বেলার সহিত চলিয়া যাইতেই বেচারী মালিকার সমস্যা লইয়া মোক্তারবাবু এবং তাঁহার আত্মীয়-স্বজনেরা উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। কন্যা-পক্ষের যাঁহারা বিবাহের উদ্যোগ আয়োজন করিতেছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মোহনের উৎসাহই সর্বাপেক্ষা বেশি। সকলে মিলিয়া তাহাকেই ধরিয়া লইয়া বরের পিড়িতে বসাইয়া দিল। মালিকা ঘোমটার ফাঁক দিয়া মোহনের দিকে চাহিয়া ফিক করিয়া একটু হাসিয়া ফেলিল।

বেলা ও ভজহরি ফিরতি রকেটে বাড়ী ফিরিয়াছে। এখন পর্যন্ত তাহারা আর ঝগড়াঝাঁটি করে নাই।

গলো গলো

১

বিবেকানন্দ রোডের বিচালি-ভবনে ভজহরি সরখেল ভালই আছে। তাহার স্ত্রী বেলা সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়া নার্সিং হোম হইতে ফিরিয়াছে। একটু সাধারণ দুর্বলতা ব্যতীত কোন উপসর্গ নাই। শেলাই করে, বই পড়ে আর মাঝে মাঝে ভজহরির সঙ্গে গড়ের মাঠে বেড়াইতে যায়।

একদিন বৈকালে বারান্দায় বসিয়া দুইজনে চা খাইতেছে। বেলা বলিল, আজ দুপুরে অনিমা-দি এসেছিলেন।

অনিমাদি কে?

তোমার কিচ্ছু মনে থাকে না। ঐ যে ওপারে তিনখানা বাড়ী পরে একটা গাড়ীবারান্দাওয়ালা বাড়ী। ঐ বাড়ীর তেতলায় ওঁরা থাকেন। আরো তো কবার এসেছেন।

তা হবে।

উনি বলছিলেন, মাণিকতলা সেকেণ্ড বাই লেনে একজন অবতার এসেছেন। সবাই যাচ্ছে, দেখা করছে, প্রণাম করছে, আশীর্বাদ নিচ্ছে—

ও!

কথাটা বুঝি কাণেই গেল না।

সবই তো শুনলাম।

কিচ্ছু শোন নি। উনি একেবারে সাক্ষাৎ অবতার—স্বয়ং শ্রীরাধিকা অবিকল আবির্ভূত হয়েছেন।

ও!

চল না, আমরাও একবার যাই। বয়স তো বাড়ছে বই কমছে না। একটু ধর্মে কর্মে মতি হওয়া ভাল।

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। কিন্তু হঠাৎ—

হঠাৎ মানে কি? একবার চল, দেখি গিয়ে কি ব্যাপার। কত লোক তো যাচ্ছে। এই ঘোর কলিযুগে যদি সত্যই পরমারাধ্যা শ্রীরাধার সাক্ষাৎ পাই, সে তো জন্মজন্মান্তরের পুণ্যফল। আর তিনি যে আমাদেরই বাড়ীর কাছে মাণিকতলা সেকেণ্ড বাই লেনে এসে উঠবেন, এটাও যেন একটা অদ্ভুত যোগাযোগ। এ সুযোগ হেলায় হারানো মহাপাপ হবে।

আমিও তো এটা বুঝতে পারছি নে, শ্রীরাধিকার এমন প্রচণ্ড সখ কেন হল? এত জায়গা থাকতে—

কেন, আমাদের এ জায়গাটা এমন কি খারাপ জায়গা?

না, না, তা নয়।

তোমার ওসব ব্যবসায় বুদ্ধি এখানে চলবে না। জগতে অনেক জিনিষ আছে, যা তোমাদের হিসাবের বাইরে। অনিমা-দি যা বললেন, তার শতাংশের একাংশ যদি আমরা বুঝতে পারি, বিশ্বাস করতে পারি, তাহলে বর্তে যাব। কবে যাচ্ছ, বল?

বেশ তো, কালই চল।

২

মাণিকতলা সেকেণ্ড বাই লেন। ছোট গলি। গাড়ী চলা মুস্কিল। এক লাইন চলিতে পারে। খানিকটা ভিতরে গিয়া গলির শেষে একটা বড় উঠান। সেই উঠানে অনেকগুলি গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। ছোট,

বড়, মাঝারি, অনেক গাড়ী। গাড়ীর বেশি ভাগ গলির বাহিরে মোড়ের কাছে অপেক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছে।

কাছেই বাড়ী, গলিও সরু, সুতরাং ভজহরি ও বেলা আস্তে আস্তে হাঁটিয়াই আসিয়াছে। গলি পার হইয়া যেখানে উঠান আরম্ভ হইয়াছে, সেখানে একটি সুসজ্জিত তোরণ। তোরণেব মাথায় লাল সালুর উপরে তুলার বড় বড় অক্ষরে লেখা—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতান্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি গলৌ গলৌ ॥

ভজহরি বলিয়া উঠিল, গলৌ গলৌ মানে কি? বেলা বলিল, তাও বুঝলে না? গলৌ গলৌ মানে গলিতে গলিতে! ভজহরি বলিল, ও!

গলির ভিতরে উভয়দিকে যাতায়াত করিতেছে অসংখ্য নরনারী। বৃদ্ধ, যুবক, শিশু, স্ত্রী, পুরুষের ভীষণ ভিড়। বেলা ও ভজহরি উঠানে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সেখানেও সুবেশ ও সুবেশা পুরুষ ও মহিলাগণের অপূর্ব সম্মেলন। সকলেই ভক্তিতে শ্রদ্ধায় বিশ্বাসে বিগলিত। সকলেরই একটা বিনীত, মোহিত, প্রায় সমাহিত ভাব। ইহাদের মধ্য হইতে একজন ঝানু উকিল ভজহরিকে দেখিয়া নমস্কার করিয়া বলিল, আপনারাও এসেছেন? বেশ, বেশ!

তা, আপনি কতক্ষণ?

আমি? আমি তো এ কয়দিন এখানেই আছি। শুধু রাত্রে একবার বাড়ী যাই। তাও রোজ নয়।

এখানেই থাকেন?

মানে যাঁরা সব দর্শন করতে আসেন তাঁদের সুবিধে অসুবিধে দেখবার জন্য লোক চাই তো। তাছাড়া ওঃ, সে কি জ্যোতি, সে কি মাধুর্য, সে কি মোহিনী মায়া! আমার সাধ্য কি, যে আমি এঁকে ছেড়ে চলে যাই।

আপনি তাহলে বাড়ী ঘর ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়েছেন ? ছেলেমেয়েদের কি ব্যবস্থা করলেন ?

আমার এ ভক্তি. এ সন্ন্যাস,. এ তো তাদেরই মঙ্গলের জন্য। তাদের দুঃখ করবার তো কিছু নেই !

তারা কি আপনার একথা বুঝবে ?

নিশ্চয়ই বুঝবে। সময়ে সবই বুঝবে। আচ্ছা, আপনারা এবার যান ওই বারান্দার পরে পর্দা দিয়ে সাজানো যে ঘরটা দেখছেন, ওখানে গেলেই শ্রীরাধিকার দেখা পাবেন। বসবার যায়গা হয়তো পাবেন না।

বেলা বলিল, বসবার কি দরকার ? কোনমতে একবার একটু দর্শন পেলেই আমাদের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হবে।

নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই। আচ্ছা, আমি ওই বারান্দার ওপাশেই থাকবো। যাবার আগে দেখা করে যাবেন, আর একটু প্রসাদ নিয়ে যাবেন।

নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।

বেলা ও ভজহরি ভীড় ঠেলিয়া অগ্রসর হইয়া উকিলবাবুবর্ণিত ঘরের দরজার কাছে আসিয়া পৌছিল এবং ভিতরের দিকে চাহিয়া দেখিল। অপরূপ সজ্জা ! বহুমূল্য পর্দা, চাঁদোয়া, অগণিত আলোর ঝাড়, অগণিত ফুলের মালা ও স্তবক, সুগন্ধি ধূপ, প্রভৃতিতে সমস্ত ঘরটি ঝলমল করিতেছে ! ঘরের মেধ্যে মেঝেয় বহু নরনারী সমবেত। ঘরের দূর প্রান্তে একখানি সুসজ্জিত খাট, সহসা দেখিলে মনে হয় কোন ধনীর গৃহে ফুলশয্যার খাট সাজানো হইয়াছে। খাট ও ভক্তবৃন্দের মধ্যে অনেকখানি স্থান গালিচা দিয়া ঢাকা, আপাতত খালি রহিয়াছে।

খাটের উপরে বহু কারুকার্যখচিত উপাধানের উপর বাম বাহু বিন্যস্ত করিয়া বামহস্তের তালুর উপর মস্তকটি সযত্নে রাখিয়া এবং পদদ্বয় সাবলীল ভাবে বিস্তার করিয়া শ্রীরাধিকা অর্ধধ্যাননিমীলিতনেত্রে ভক্তবৃন্দের প্রতি

সানুগ্রহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। মাঝে মাঝে একটি অনির্বচনীয় হাসির রেখা অধরে ফুটিয়া উঠিতেছে। সুকোমল মুখখানি পদ্মের মত শোভা পাইতেছে। শাড়ী ও অলঙ্কারের সুনিপুণ বিন্যাসে সমস্ত খাটখানির উপরে একটি স্বর্গীয় সুষমা নামিয়া আসিয়াছে।

বেলা ও ভজহরি মুগ্ধ নেত্রে দেখিতেছে। খুব ইচ্ছা হইতেছে, একবার কাছে গিয়া প্রণাম করিয়া আসে। পাশে এক ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাঁহাকে ভজহরি বলিল, অপনারা প্রণাম করেছেন? এখন ওখানে গিয়ে প্রণাম করাটা কি ঠিক হবে?

এখন আর যাবেন না। দূর থেকেই হাত জোড় করে বা মনে মনেই প্রণাম করুন।

বেলা ও ভজহরি তাহাই করিল।

ভজহরিকে একটু একান্তে ডাকিয়া ভদ্রলোকটি বলিলেন, কি অপূর্ব ক্ষমতা, কি অপূর্ব মহিমা!

তাই তো দেখছি।

হ্যাঁ, ভদ্রলোক—

ভদ্রলোক কাকে বলছেন?

ওই যে যিনি শ্রীখাটে শ্রীরাধিকাবতাররূপে শুয়ে আছেন।

উনি ভদ্রলোক, মানে পুরুষ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাও জানেন না? উনি কাশীপুর জুটমিলে ক্যাশিয়ার ছিলেন। বয়স বিয়াল্লিশ হবে। চাকরি যাবার পর—

ও।

হ্যাঁ। ওঁর সত্যই ঐশী শক্তি আছে।

তাই তো দেখ্‌ছি।

বেলা ভজহরির হাত ধরিয়া একটু টান দিয়া বলিল, কি সব গুজগুজ

করছ? আমি সব শুনেছি। এদিকে এস। ঘরের ভিতর চেয়ে দেখ।

বেলা ও ভজহরি এবং ওই ভদ্রলোকটিও ঘরের ভিতরে চাহিয়া দেখিলেন। প্রায় পনের ষোলটি তরুণী ধীরে ধীরে খাটের নিকটে কার্পেটের উপর আসিয়া সমবেত হইয়াছে। পরিধানে অতি আধুনিক নৃত্যের বেশ! দেখিলেই নন্দলাল বসুর ছবির কথা মনে পড়ে। সঙ্গীতের এবং যন্ত্রের ঝঙ্কারের আরম্ভের সঙ্গেই ইঁহারা ফুলের মালা ও আরতির দীপ হাতে করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। বিবিধ ভঙ্গিতে অনেকক্ষণ পর্যন্ত নৃত্য চলিল। সুনিপুণ নূপুরশিঞ্জনে এবং অপরূপ রূপের হিল্লোলে আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই মন শ্রীরাধিকার শ্রীচরণে বিলীন হইয়া গেল।

বেলা ভজহরিকে আস্তে আস্তে বলিল, দেখেছ, এত প্রলোভন, তবু ওঁর মনে কোন বিকার নেই।

আমার মনেও তো কোন বিকার হচ্ছে না।

কি যে বল তার ঠিক নেই। তোমার কথা কে জিজ্ঞেস করছে শুনি? এসেছ তীর্থস্থানে, এখানেও তোমার রসিকতা।

স্বভাব যায় না মলে।

ইতিমধ্যে দেখা গেল, সকলেই যেন উঠিয়া স্থানত্যাগের উদ্যোগ করিতেছেন। শুনা গেল, নৃত্য শেষ হইয়াছে। এবার শ্রীরাধিকা উঁহার এক বিশিষ্ট ভক্তের বাড়িতে যাইবেন, নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে।

উঠানের মাঝখানে একখানি চকচকে ফোর-সীটার দাঁড়াইয়া আছে। এই গাড়িতেই শ্রীমতী যাইবেন। চারটি সীট-বিশিষ্ট এ গাড়িতে ক্রমশ উঠিলেন শ্রীরাধিকাসহ দশ জন। তিনটি কুমারী, তিনটি সধবা, দুইটি বিধবা এবং ড্রাইভার। প্রত্যেকেই বিবিধ প্রকার অতি মূল্যবান্ পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারে ভূষিতা। সকলেরই অধরে একটা রমণীয় স্মিত হাসি।

সমগ্র গাড়ীখানি যমুনার জলের মত ঝলমল করিয়া উঠিল। গাড়ীখানি ধীরে ধীরে উঠান ছাড়িয়া গলি ধরিয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়া গেল।

৩

বেলা ও ভজহরি বাড়ী ফিরিবে। উকিলবাবুর সহিত দেখা করিবার কথা বারান্দার এক কোণে। সেখানে গিয়া দেখিল, উকিলবাবু একটি ক্যাশবাক্স বন্ধ করিতেছেন। ভজহরিকে দেখিয়া বলিলেন, এই যে, আমি ভাবছিলাম, আপনি বুঝি চলেই গেছেন।

আপনার সঙ্গে দেখা করে যাবারই তো কথা ছিল।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। বসুন।

না, এখন আর বসব না। অনেকক্ষণ এসেছি। তাছাড়া ওঁর শরীরটাও তো তেমন ভাল নয়।

না, না, সে কি হয়? একটু বসে যান। ওরে, কে আছিস, দুখানা চেয়ার এনে দে তো।

একটি চাকরগোছর লোক দুখানা গদি-মোড়া চেয়ার আনিয়া দিল। বেলা ও ভজহরি বসিল।

উকিলবাবু বলিলেন, আপনারা তো এই প্রথম এলেন।

হ্যাঁ।

কেমন লাগলো?

ভজহরি বলিল, চমৎকার। বেলা বলিল, ভারি চমৎকার। কি সুন্দর! ঠিক যেন বৃন্দাবনের সেই শ্রীরাধিকা। তবে ঘাগরা আর জলের কলসী নেই।

হ্যাঁ। আপনি ঠিক ধরেছেন। কলিকালের কলুষ নাশ করবার জন্যই তো ওঁর এত কষ্ট করে আবার ধরাধামে আসা।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

কিন্তু উনি তো শিগগিরই চলে যাচ্ছেন!

কোথায়? কেন?

এ অঞ্চলের পরিত্রাণ, বিনাশ এবং ধর্মসংস্থাপন প্রায় শেষ হয়ে গেছে। যেটুকু বাকী আছে, আর দু'দিনের মধ্যেই হয়ে যাবে।

বেলা একটু কাতরস্বরে বলিল, এরই মধ্যে চলে যাবেন? কেন আমরা আগে এলাম না?

ভজহরি সান্ত্বনা দিয়া বলিল, তার জন্য আর দুঃখ কেন? এমন সব অবতারের সঙ্গে সাক্ষাৎ একবারও যা, শতবারও তাই। বেশি দেখলেই কি বেশি ভক্তি হয়?

বেলা আবার কাতরস্বরে বলিল, উনি চলে গেলে তো আমরা ওঁকে ভুলে যাবো। আমাদের দুর্বল সংসারী মন। কিছুদিন পরে আমাদের আত্মা তো আবার যে তিমিরে সেই তিমিরে।

উকিলবাবু বলিলেন, আমিও অবিকল সেই কথা বলতে যাচ্ছিলাম। এই যে সব ভক্তসমাগম, এদের দুদিন পরে কি হবে? ইনি যখন এই বৃন্দাবন ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবেন, তখন কি নিয়ে এঁরা থাকবেন?

ভজহরি বলিল, ওঁর ফটো আছে? যদি থাকে, তবে এক কপি দিন, বাঁধিয়ে রাখবো।

বেলা বলিল, হ্যাঁ, মালা পরাবো, চন্দন পরাবো, পুজো করবো—

ভজহরি বলিল, ধ্যান করবো, স্বপ্ন দেখবো—

বেলা একটু অপাঙ্গে ভজহরির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাকে চুপ করিতে নির্দেশ দিল।

উকিলবাবু বলিলেন, উনি তো ফটো তুলতে দেন না।

কেন?

ফটোর কথা বললেই কেঁদে ফেলেন। বলেন, আমি মথুরায় গিয়ে আমার প্রাণসখার সঙ্গে একসঙ্গে ফটো তুলবো।

বেলা বলিল, এমন নইলে কি আর অবতার? অবতার মানে তো শ্রীরাধা নিজেই, অর্থাৎ স্বয়ং।

উকিলবাবু বলিলেন, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। দেখুন, আপনারা এক কাজ করুন। এমন একটা কিছু নিয়ে যান, যাতে শ্রীরাধার মূর্তি সর্বদা আপনাদের মনের সম্মুখে সমুজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

ভজহরি বলিল, এ বিষয়ে আপনার মত কি?

আমি বলি, শ্রীরাধার একগাছি চুল নিয়ে যান। যত্ন করে রাখলে চিরকাল থাকবে।

বেলা বলিল, এতো পরম সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু এমন সৌভাগ্য কি আমাদের হবে।

উকিলবাবু বলিলেন, আপনারা আমার বহু পুরাতন মক্কেল। সেই জন্যই এ প্রস্তাব করেছি। অন্য কাউকে হলে কি আর এমন কথা বলতুম?

বেলা মিনতিভরা স্বরে বলিল, আপনি তা হলে এর ব্যবস্থা করুন।

উকিলবাবু বলিলেন, দেখি চেষ্টা করে। কয়গাছি চুল তোলা ছিল। সেগুলি আছে কিনা কে জানে। আজ সকালে আবার বড়বাজারের একজন ধনী ব্যবসায়ী একগাছি চুলের জন্য আড়াই-শো টাকা বায়না দিয়ে গেছে।

বেলা বলিল, আমাদের একগাছি আপনাকে দিতেই হবে।

উকিলবাবু উঠিয়া গেলেন এবং একটু পরে একটী কাগজের পুরিয়া আনিয়া বলিলেন, এর দাম কিন্তু অনেক।

বেলা, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।

ভজহরি জিজ্ঞাসা করিল, কত দিতে হবে ?

উকিলবাবু বলিলেন, কত দিতে হবে মানে কি ? রামঃ, এসব কি দরাদরির জিনিষ। যাক্‌গে, আপনি আমার পুরোনো মক্কেল। এক হাজার এক টাকা হলেই হবে, প্লাস্‌ সেলস্‌ ট্যাক্স।

ভজহরি বলিল, এত টাকা !

বেলা বলিল, এ আর এমন বেশি কি হ'ল ? আমাদের সৌভাগ্য যে একগাছি চুল উনি সংগ্রহ করে দিতে পারলেন। যাও, নিয়ে এস গে টাকাটা। আমি এখানে অপেক্ষা করছি।

৪

পরদিন সকালে। চা খাওয়া শেষ করিয়া খবরের কাগজ হাতে লইয়া ভজহরি টেবিলের একপাশে বসিয়াছে। অপর পাশে বেলা। সম্মুখে শ্রীরাধার চুলের পুরিয়া। কাগজের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে ভজহরি বলিল, আচ্ছা, এমন কাজ মানুষে করে ?

করে, তা তো প্রমাণ হয়েই গেল। আমরা তো কোন ছার ! দেখলে তো মোটরগাড়ীর ঘটা ! কত জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, লক্ষপতি ব্যবসায়ী, পি. এচ-ডি, ডি. এস্‌-সি হাবুডুবু খাচ্ছে—

তোমার বুদ্ধিতেই তো এতগুলো টাকা—

আমার কথা তুমি শুন্‌লে কেন ? তুমি যত সব খরচপত্র করো, সব কি আমার পরামর্শ নিয়ে কর ?

এটা তো শুধু আমার ব্যাপার নয়।

সত্যিই বলছি, আমি কেমন অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। বোধহয় আমার সেই কঠিন অসুখের ফল।

আচ্ছা, ওই উকিলবাবুটা কি হিপনটিজ্‌ম্‌ জানে নাকি? ওখানেই এক ভদ্রলোক বলছিলেন, ওই উকিলবাবুটিও একটি মহাপুরুষ।

তিনিও মজেছেন বোধ হয়।

বোধ হয়।

আমি না হয় মেয়েমানুষ। তুমি মজলে কিসে? বড় যে বড়াই করা হচ্ছিল, আমার মনে বিকার হচ্ছে না।

চলোয় যাক্‌গে ওসব কথা—বলিয়া ভজহরি চুলের পুরিয়াটা নষ্ট কাগজের ঝুড়ির মধ্যে ফেলিয়া দিয়া খবরের কাগজে মন দিল। বেলা বারান্দায় গিয়া মনটাকে সহজ করিয়া লইবার জন্য জনস্রোতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল।